সুভাষ চক্রবর্তী

—পরিবেশক—

নবগ্রন্থ কুটীর : ৫৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট ; কলি ১২

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
১লা বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশক
শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬/এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
বিকাশ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রক
মোহন প্রেস

মুদ্রক
গৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯নং গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

ব্লক
গোষ্টবিহারী চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্স

তিন টাকা
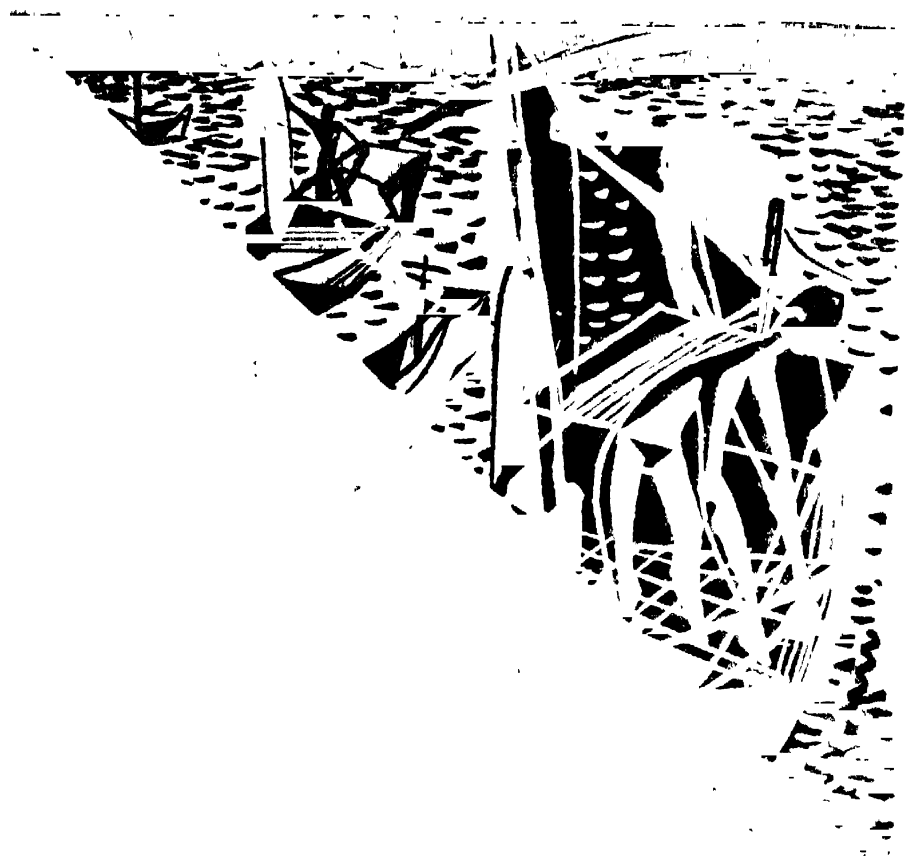
লেখকের কথা ঃ

'অন্ধ দেবতা'র ঘটনাবিন্যাস ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি থেকে কিঞ্চিদধিক দ্বি-বর্ষকাল বিস্তীর্ণ।

সাপ্তাহিক 'এশিয়া' পত্রিকায় 'অন্ধ দেবতা' ধারাবাহিকভাবে প্রথম বের হয়। কিন্তু উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই 'এশিয়া'র আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায়।

'এশিয়া'র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময় উপন্যাসখানি যে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে কথা আমি জানতে পারলাম 'এশিয়া' বন্ধ হয়ে যাবার পর পাঠকদের কাছ থেকে কয়েকখানা ব্যক্তিগত চিঠি পেয়ে।

'এশিয়া'র প্রকাশিত কিছু অংশ পাঠককুলের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। সমগ্র উপন্যাসখানি পাঠে সে ভাব অক্ষুণ্ণ থাকলে, আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু বহু ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে 'অন্ধ দেবতা'র পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন। অতঃপর লেখক সম্বন্ধে তাঁর আনন্দ-কণ্ঠ যেভাবে অকুণ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এখানে তার বিস্তৃত বর্ণনায় আমি কিন্তু ততোধিক কুণ্ঠ। তাঁর সহৃদয়তার কথা আমার মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি লিখি। আরও বেশী করে লেখবার জন্যে আমাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ঋণ স্বীকার করতে বাধা নেই, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও কি সব ঋণ শোধ করা যায়?

কলিকাতা
দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৩

সুভাষ চক্রবর্তী

সারাদিন মেঘলা। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ। থামবে বলে তো মনে হয় না। আকাশটা যেন ঝাঁজরা হয়ে গেছে। টিপ টিপ বৃষ্টির বিরাম নেই।

গলির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল প্রসাদী।

অপরিসর গলি। এবড়ো খেবড়ো আর বহু গর্তে ভরা।

গলির মুখে গ্যাস-পোষ্ট। গ্যাসের আলোতে যতটুকু চোখে পড়ে, তাতে গলিতে আর পা বাড়াতে ইচ্ছা হয় না। খিচ কাদার কিছুটা অংশ আর গর্তে জমা জল গ্যাসের আলোয় চিক চিক করছে। তারপর জমাট বাঁধা অন্ধকার। দৃষ্টি চলে না।

খিচ কাদায় পা ফেলতে গা ঘিন ঘিন করে প্রসাদীর। তবুও অন্ধকার আর জল কাদা অগ্রাহ্য করে, বৃষ্টি মাথায় এগিয়ে চলল সে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে চলেছে। ঘরের টানে পা তাকে বাড়াতেই হবে।

সদা ঠাকুরের হোটেলে ঝিয়ের কাজ করে প্রসাদী। সারাদিন হোটেলেই থাকতে হয়। রাত্রে নিজের বাসায় শুতে আসে। বাসা বলতে, মাত্র একখানি ঘর। অন্য সব ঘরেও তার মতই আরও কয়েকটি বাসিন্দা। এক একটি ঘরের স্বতন্ত্র বাসিন্দা।

সদা ঠাকুরের হোটেলে কাজ নেবার পর, হোটেলের কাছে এই গলিতে ঘর ভাড়া নিয়েছে প্রসাদী।

সাত টাকা ভাড়া। ভাড়াটা তার পক্ষে বেশি। তবুও ঘরখানা সে ভাড়া নিয়েছে। সদা ঠাকুর বলেছিল, কাজ কি তোমার সাত টাকায় ঘর ভাড়া করবার? রাত্রে হোটেলেই তো তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পার। অনেক জায়গা রয়েছে হোটেলে।

রাজী হয় নি প্রসাদী। রাজী হতে দেয়নি তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা। সে অনেক কথা—

নিরালম্ব, নিরাশ্রয় হয়ে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করেছিল সে ভদ্র-পরিবারে। রাত্রে থাকতেও হ'ত সে বাড়িতে। কিন্তু নিরুপদ্রবে সেখানে রাত্রি-যাপন তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কাজ ছেড়ে দিল সে।

পুনরাবৃত্তি ঘটল আরও কয়েক জায়গায়।

শেষে সদা ঠাকুরের এই হোটেল। হোটেলে সে নিজে এসে কাজ নেয় নি। কাজ করবার ইচ্ছাই তার ছিল না।

সর্বশেষ যে বাড়িতে সে কাজ করত, সে বাড়ির গৃহিণী চির-রুগ্না। আটটি ছেলে-মেয়ে। কোলেরটি ছ'মাসের। গৃহিণীর রুগ্নতার কারণও এই অতি-প্রসব।

মধ্যবিত্ত কেরানীর সংসার। স্ত্রীকেই সব কাজ করতে হয়। তাই শেষপ্রসবের পর গৃহিণীর শরীর অচল হয়ে পড়লে, অচল হয়ে পড়ল তার সংসারও। ছেলেমেয়ের ধকল, কর্তার আফিসের ভাত—এসব আর হয়ে ওঠে না। সেই সময়ে প্রসাদী কাজ পেল সে বাড়ীতে।

এক-মাথা টাক, নিরীহ গো-বেচারী চেহারা গৃহস্বামীর। বাড়ীতে অন্য পুরুষ মানুষ নেই। নিশ্চিন্ত হয়েছিল প্রসাদী।

কিন্তু তার এই নিশ্চিন্ততা টিকল না।

একদিন রাত্রে কার স্পর্শে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। ঘুম ভেঙ্গে গৃহস্বামীকে দেখতে পেল তার দেহের সান্নিধ্যে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে।

হাত চেপে ধরল ভদ্রলোক। লোভ দেখাল প্রসাদীকে। না পেরে, দেখাল ভয়।

প্রসাদী বলল,—আপনি এখনই আমার ঘর থেকে না গেলে, আমি চেঁচাব।

ভদ্রলোক চলে গেল। কিন্তু পরদিন সকালে চোর বদনাম দিয়ে তার প্রাপ্য মাইনে থেকেও বঞ্চিত করল প্রসাদীকে।

রিক্ত হস্তে আবার পথে নেমে এল প্রসাদী।

মানুষকে আর বিশ্বাস নেই। মানুষের ওপর ঘৃণা হ'ল প্রসাদীর, ঘৃণা হ'ল নিজের ওপরেও।

কাজ খোঁজার আগ্রহ তার আর ছিল না।

দু'দিন অনাহারে কাটল। আর সহ্য হয় না। ক্ষুধার কথা বলে, ভিক্ষা করতে সাহস হয় না। কলের জল খেয়ে খেয়ে আর খেতে ইচ্ছা হয় না। খেলেও গা গুলিয়ে ওঠে। এতবড় সহরে কত পার্ক, কত রাস্তা-ঘাট, বিশ্রামের জায়গা—তবুও কোথাও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেনি প্রসাদী। কে কোথা থেকে এসে পড়বে—শুধু এই ভয়।

পূর্ব দিন ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার একটি বাঁধানো স্নান-ঘাটে সে আশ্রয় নিয়েছিল। অনাহারে শরীর অবসন্ন; অনিদ্রায়, ভয়ে, জীবনের ওপরেও তার মায়া ছিল না। মা-গঙ্গার কোলে গিয়ে সকল জ্বালা জুড়াবে ঠিক করল। ভোর বেলা সে সিঁড়ি বেয়ে জলের দিকে এগিয়ে চলল। সে মরবে—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

কিন্তু বাধা পড়ল।

সদা ঠাকুরের ভোরবেলা গঙ্গাস্নানের অভ্যাস। ঘাটে এসে প্রসাদীকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখল সে। প্রথমটা সন্দেহ করে নি কিছু। ভাবল, মেয়েটি বোধ হয় গঙ্গা-স্নান করতে এসেছে। কিন্তু মেয়েটি গভীর জলে ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। মেয়েটির ভাবভঙ্গি দেখে সদা ঠাকুরের সন্দেহ হ'ল। দেখল, ঘাটে কোন শুকনো কাপড় রাখেনি মেয়েটি।

প্রসাদী ততক্ষণে গলা-জলে নেমে পড়েছে।

চিৎকার করে ডাকল সদা ঠাকুর,—দাঁড়াও আর এগিয়ো না।

থামল প্রসাদী।

সদা ঠাকুর জলের কাছে এগিয়ে এসে বলল,—উঠে এস।

একটু ইতস্ততঃ করে, উঠে এল প্রসাদী।

সদা ঠাকুরের কাছে উঠে আসতে, সে বলল.—মরতে চলেছ ?

—হ্যাঁ।

তারপর সদা ঠাকুর তার কাছে সমস্ত শুনল।

তাকে হোটেলে নিয়ে এল। শুকনো কাপড় দিল, খেতে দিল।

সদা ঠাকুরের হোটেলে কাজও জুটল প্রসাদীর। সদা ঠাকুরের 'পবিত্র হিন্দু ভোজনালয়'—পাইস হোটেল। সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। তবুও এখানে কাজ করে আরাম পায় প্রসাদী।

তার কাজের সুখ্যাতি করে হোটেলের সবাই। সদা ঠাকুরও করে, তবে মুখে বলে না। বরঞ্চ তার হোটেলে কাজ দিয়ে প্রসাদীকে যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, এ কথাই প্রচার করে সদা ঠাকুর। বারো টাকা মাইনে পায় প্রসাদী। বারো টাকা নাকি অনেক বেশী দিচ্ছে সদা ঠাকুর।

প্রসাদী বোঝে সব, বলে না কিছু। সদা ঠাকুর কৃপণ, কিন্তু সৎ। তাকে যে সদা ঠাকুর মৃত্যুর হাতে থেকে বাঁচিয়েছে—এ কথাও তো মিথ্যে নয় ? সদা ঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে সে।

সারাদিন ভূতের মত খাটে সদা ঠাকুরের হোটেলে। রাত্রে সব কাজ শেষে নিজের ভাত নিয়ে বাসায় আসে প্রসাদী।

নিজের ঘরে, পরিচিত পরিবেশে স্বস্তি অনুভব করে সে। প্রতিবেশী মেয়েরাও প্রসাদীকে ভালবাসে। ভালবাসে তার নম্র সহজ ব্যবহারের জন্যে। তাদের ওপরে প্রসাদীর ভরসাও বড় কম নয়। এদের মাঝে সে সাহস পায় অনেকখানি।

আজ বৃষ্টির জন্যে বস্তিটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়েছে সবাই সকাল সকাল।

প্রসাদীও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম আসছে না। টিনের চালের ওপর টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ। শুনতে তার ভাল লাগে এ শব্দ। বিছানায় শুয়ে এরকম আরও কত রাত্রি টিনের চালের ওপর বৃষ্টিপতনের শব্দ শুনেছে সে। এ শব্দ শোনার মধ্যে আছে মোহ। শুনতে শুনতে সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আসে। ছোট্ট বেলা থেকে এই শব্দ-শোনার মোহে সে বাঁধা পড়েছে।

মনে পড়ল, তার ছেলেবেলার কথা। মায়ের বুকের কাছে শুয়ে, টিনের চালের ওপর বৃষ্টি পড়ায় শব্দ শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ত। বড় হয়ে, এ রকম শব্দ শুনতে শুনতে মন তার চলে যেত কোন মায়াচ্ছন্নলোকে। কিসের সুরভিতে মত আবিষ্ট হয়ে পড়ত! ক্ষণকালের জন্যে মায়াপুরীর রাজকন্যা হয়ে সে বিচরণ করত অচেনা-অজানা বিচিত্র-মধুর পরিবেশে।

বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যেত না।

এখন আর সে সব মনে হয় না। দুঃখের চাপ মনের সুকুমার ভাবকে পিষে মেরে ফেলেছে।

মনে পড়ল, মথুরাপুরের কথা। কত্তাদার কথা। কত কথা, কত ঘটনা ভীড় করে আসে মনের পটে।

কত্তাদা বলত, মথুরাপুর শ্মশান হইছে। মড়ার মাংস ছিড়্যা খাতিছে শকুনে।

কত্তাদা জানত না। মথুরাপুরের বাইরের জগৎকে দেখে নি কত্তাদা।

প্রসাদী দেখছে, শ্মশান মথুরাপুরেই শুধু শকুন চরে না, শকুনের মেলা সর্বত্র। শকুনের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে অষ্টাদশী প্রসাদী তার দেহটাকে আড়াল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

মানা করেছিল কেদারের মা। বলেছিল, যাস্ নি রাই, কলকাতায় যাস্ নি। গাঁয়ে আমি আছি, তোর ভয়ডা কি?

কলকাতায় গেলি খাবি কি? পরাণডা শয়তান—উয়্যাকে বিশ্বাস কি?

পরাণের ওপর ভরসা যেন প্রসাদীরই ছিল কত!

রঙীন স্নুতোয় বোনা কল্পনার জালে, রামধনুর ঝিকি-মিকি খেলা—তাকে আকর্ষণ করেছিল কলকাতায়। রাঙ্গা-দাদাবাবুর কলকাতায়। পরাণ তো বাহন মাত্র।

পরাণ এসে যেদিন কলকাতা যাবার প্রস্তাব করেছিল, কলকাতার নামে অনেকখানি ভরসা সঞ্চিত হয়েছিল তার মনের কোণে। কলকাতায় রাঙ্গাদাদাবাবু থাকে।

কিন্তু এতবড় শহরে কোথায় রাঙ্গাদাদাবাবু? কি তার ঠিকানা? —কিছুই জানে না প্রসাদী।

রাঙ্গাদাদাবাবুর দেখা পেল না সে। মথুরাপুরে বসে কলকাতা সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা কলকাতায় এসে বদলে গেছে। বুঝতে পেরেছে সে, হয়ত কোনদিনই রাঙ্গাদাদাবাবুর সঙ্গে তার দেখা হবে না। আর—আর, যদিবা কোনদিন হঠাৎ দেখা হয়ে যায়ও, সদা ঠাকুরের হোটেলের ঝিকে রাঙ্গাদাদাবাবু চিনতে পারবে কি? না, পারবে না। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে সে কথা প্রসাদী। মথুরাপুরের মোড়ল ঈশান মণ্ডলের আদরের নাতনী আর সদা ঠাকুরের হোটেলের ঝি—এর মাঝে যে অনেকখানি ব্যবধান!

সময়ের ব্যবধানও অনেকখানি। প্রায় দু'বছর। দু'বছরে কত বদলে গেছে সে! নিজের পরিবর্তনে হাসি পায় প্রসাদীর। অনেক দুঃখে হাসে। কাঁদেনা আর, কান্না শুকিয়ে গেছে।

মোড়ল ঈশান মণ্ডলের আদরের নাতনী, যৌবনোচ্ছল ষোড়শী প্রসাদী। আর, কলকাতার পাইস হোটেলের উপেক্ষিত, কর্মক্লান্ত ঝি প্রসাদী। এ দুএর মধ্যে ব্যবধান যতখানিই থাক, কার্যকারণের যোগসূত্রও একটা আছে ঃ

মথুরাপুর। দুঃখ-দুর্দশাজীর্ণ বাংলার গ্রাম।

গ্রামের মত মোড়ল ঈশান মণ্ডলও জরাজীর্ণ। সংসারে তার একমাত্র অবলম্বন নাতনী প্রসাদী। আট-বছর বয়সে মা-বাপ হারিয়েছে প্রসাদী। কত্তাদা ছাড়া তারও কেউ নেই।

বাড়ির উঠানে শশার মাচা। মাচা ভর্তি শশা ধরেছে। মাচার নীচে থেকে হাত বাড়িয়ে একটা একটা করে শশা ছিঁড়ছিল প্রসাদী।

সারা দুপুর ধরে কেদারের মায়ের সঙ্গে মুড়ি ভেজেছে সে। কচি-শশা দিয়ে মুড়ি খেতে খুব ভালবাসে প্রসাদী। কত্তাদাও ভালবাসে। তেল-নুন মাখিয়ে শশা-মুড়ি খেতে দেবে কত্তাদাকে।

দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছিল ঈশান মণ্ডল। শশার মাচার নীচে, শশা ছিঁড়তে ব্যস্ত যুবতী নাতনীর দেহের দিকে চোখ পড়ল বৃদ্ধের। তার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রসাদীর জন্য একটা মস্ত ভাবনা তার সমস্ত মন জুড়ে বসেছে। নিজে চোখ বুজলে, মেয়েটির যে কি হবে সেই ভাবনা!

কোঁচড়-ভর্তি শশা নিয়ে উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়াল প্রসাদী।

মেঘ করেছে। বিকেলের পড়ন্ত বেলা ঘনীভূত অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রসাদী চিৎকার করে বলল,—

কত্তাদা গো, ম্যাঘখান দেখিছ? পচ্চিম-কোণে কালকাসিন্দি, আকাশ য্যান ভ্যাংগা আসতিছে।

—দেখিছি। দেখ্যাই তো ভাবতিছি। বিলির উপর পরদেশী বাবুরা রইছে। বাবুগরে আজ নাকাল কর্যা ছাড়বিনি ঐ পচ্চিমে ম্যাঘ। এ ম্যাঘে বিষ্টির জোর থাকে না। কিন্তুক বাসাতের দাপটে উইড়্যা নিয়্যা যায় ঘরের চাল। বাবুগরে ডিঙ্গি আজ ভ সায়ে নিয়্যা যাবি নি, তাই ভাবতিছি।

বৃদ্ধের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল প্রসাদী।

তাকিয়ে আবার দেখল, কালো-বরণ মেঘের ঘনঘটা। একটু পরেই ঝড় উঠবে,—ঠিকই বলেছে বুড়ো। কোন্ মেঘে ঝড় হয়, আর কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়, ঈশান মণ্ডলের তা অজানা নয়। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে প্রসাদী। তার ওপর বুড়োর নাতনী। মেঘ দেখে, ঝড় হবে কি বৃষ্টি হবে, সেও তা বুঝতে পারে।

বাবুদের কথা ভেবে শঙ্কিত হ'ল প্রসাদী,—কলকাতার বাবুরা তো জানে না ঝড়ের দাপট আর বিলির শয়তানি। এ গাঁয়ির লোকির জন্যিই তারা এ গাঁয়ি আস্যা বাসা বাঁধিছে মত্যার বিলি, নাওয়ের ওপর।

বাবুরা এসেছিল মণ্ডলের বাড়ীতে। মণ্ডল গাঁয়ের মাতব্বর—বয়সে প্রাচীন। গাঁয়ের লোক মণ্ডলের বাড়ীতেই তাদের প্রথম নিয়ে এসেছিল।

কোথা থেকে কি ক'রে বন্যার খবর পেয়ে এই ক'টি বাবু কলকাতায় থেকে তাদের গাঁয়ে এসেছে সাহায্য করতে।

বর্ষায় ধান পাট সব ডুবে গেছে। লোকের খাবার সংস্থানও নেই। তার ওপর আছে নায়েবের জুলুম।

নায়েব 'নাড়ি মশায়ের' অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে গাঁয়ের সবাই। নায়েব ননী লাহিড়ীর পদবীর অপভ্রংশ গাঁয়ের লোকের মুখে 'নাড়ি মশাই' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সামনে সবাই বলে

'নায়েব মশাই', আড়ালে বলে 'নাড়ি মশাই'। গাঁয়ের জমিদার গাঁ ছেড়েছে অনেকদিন। নায়েবই এখন গাঁয়ের সর্বেসর্বা।

এবার জুলুমটা একটু বাড়াবাড়ি। হাল সন শোধ ক'রে খাজনা দিতে হবে, নাহলে ভিটেমাটি উচ্ছেদ ক'রে দেবে—শাসিয়েছে 'নাড়ি মশাই'।

মণ্ডলের বাড়িতে বসে বাবুরা সেদিন অনেক কথাই বলল। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে প্রসাদী দেখছিল সব। শুনলও তাদের সব কথা,—কিন্তু অনেক কিছুই বুঝতে পারল না সে। তবে এটুকু বুঝল, বাবুরা বলছে,—নায়েবের হাতে মার খাবার দিন আর নেই। বাধা দিতে হবে নায়েবকে, সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। জমিতে যে বাস করে, জমি তার। ফসল ফলায় যে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে -জমির ওপর দাবী সকলের চাইতে তার বেশী।

ভাল লাগল, খুব ভাল লাগল প্রসাদীর, বাবুদের কথাগুলো।

উন্মনা হয়ে যায় সে।

ধলা-পানা চশমা-পরা বাবুটি, কি সোন্দর চেহারা। কথা-গুল্যানও কি মিষ্টি! সেই বাবুই বলতিছিল সব কথা। তাকে কেমন মান্য করে সবাই। আহা, লোকের ভাল করার ইচ্ছে বুকে নিয়ি ছুটে আইছে রাজার ছাওয়াল। রাজার ছাওয়ালই তো, তা না হলি কি অত সোন্দর চেহারা হয়! চাঁদপানা বাবুরা গরীবদের জন্যি এত কষ্ট করতিছে ক্যান?

সত্যিই প্রসাদী ভেবে পায় না, গরীব গ্রাম্য লোকেদের জন্যে ভিন্‌দেশী বাবুরা এত কষ্ট সহ্য করছে কেন? ছোট বেলা থেকে সে দেখে আসছে, গরীব আর ভদ্রলোক দুটো আলাদা জাত। ভদ্র-লোকরা যেন গরীবদের প্রভু। গরীবদের ওপর জুলুম করবার সনদ যেন ভগবানের কাছ থেকে তারা পেয়েছে। গ্রাম্য পরিধির মধ্যে, কোন ভদ্রলোককে কোনদিন গরীবদের জন্যে ভাল কিছু করতে দেখেনি প্রসাদী—তার ষোল বছরের জীবনে। তাই কলকাতা

থেকে বাবুরা এসে কেন গরীবদের জন্যে কষ্ট সহ্য করছে—এটা তার কাছে একটা প্রশ্ন।

—ইডা কি ভাল হয় রে পেসাদী? আমাগরে গাঁয়ি আস্যা বাবুরা বিপদে পড়বি—তা কি হয়? তুই কি কোস, আমি তাগরে ডাক্যা নিয়্যা আসি, এ্যা?

—হ্যাঁ, তাই যাও কত্তাদা। ম্যাঘখান ভাল ঠেকতিছে না। চার দিকি জল আর জল, বর্ষাৎ কালের মত্যার বিল য্যান সমুদ্দুর। বাবুগরে ড্যাক্যা নিয়া অ্যাস তুমি।

—সেই ভাল। লক্ষ্মীরে তুই তোল,—আমি তাগরে নিয়্যা আসি।

পালানের নীচে ডিঙ্গি বাঁধা আছে। মণ্ডলের পালান এখনও ডোবেনি। অনেক উঁচু তার পালান। উঠান আরও উঁচু। অন্য সব বাড়ীতে উঠানেই ডিঙ্গি চলছে। কলাগাছের ভেলায় এঘর-ওঘর করতে হয়।

ডিঙ্গি নিয়ে চলল মণ্ডল, মত্যার বিলে।

লক্ষ্মীকে তাড়াতাড়ি গোয়ালে তুলে, চাড়িতে খড়-জল মাখিয়ে দিল প্রসাদী।

অন্যদিন সে লক্ষ্মীর গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দেয়, তার গায়ের ডাঁশ তাড়িয়ে দেয়। নিত্য এই সেবা লক্ষ্মী উপভোগ করে চোখ বুঁজে, রোমন্থন করতে করতে। আজ প্রসাদীর বড় তাড়া। আজ ওসব কিছুই করল না সে। লক্ষ্মী মনঃক্ষুন্ন হ'ল প্রসাদীর আজকের এই অনাদরে। অভিমান হ'ল তার।

কিন্তু অবলা লক্ষ্মীর অভিমান অনুভব করবার মন আজ হারিয়ে ফেলেছে প্রসাদী। অন্য দিন লক্ষ্মীর সঙ্গে কত মনের কথা কয় সে। লক্ষ্মীকে বলে মনের বাষ্প হাল্কা করে। নিজের মন দিয়ে লক্ষ্মীর মনও বুঝতে পারে সে। তার সঙ্গে হাসে, কাঁদে, কথা বলে।

কিন্তু আজ তার বড় তাড়া। বাবুরা এখ্‌খুনি এসে পড়বে।

গোয়ালের কাজ সেরে, ঘর-দোর ঝাঁট দিল। তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়ে প্রণাম করে উঠতেই কত্তাদার গলা শুনতে পেল সে।

—কই রে, ক'নে গেলি দিদি ?

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে হাঁক দিল মণ্ডল। তার পেছনে চারজন বাবু। সকলের হাতেই কিছু কিছু জিনিষ-পত্র।

সামনে এসে প্রসাদী বলল,—ঘরে নিয়্যা বসাওগা কত্তাদা।

—চলেন, ঘরে যাই। বিষ্টি আসতিছে।

—শুধু শুধু তুমি আমাদের নিয়ে এলে মণ্ডল! ঝড় জল আমাদের গা-সহা হয়ে গিয়েছে। ওরকম অনেক গেছে মাথার ওপর দিয়ে।

অনিরুদ্ধের কথা শুনে হেসে উঠল মণ্ডল।

বলল,—এখন ঘরে ওঠেন তো, উঠ্যানে দাঁড়ায়ে ভিজে লাভ কি ?

আর কথা না বাড়িয়ে মণ্ডলের পেছন পেছনে তারা ঘরে গিয়ে উঠল।

ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে রেখেছিল প্রসাদী। সেই মাদুরের ওপর তারা বসল।

ইতিমধ্যে ঘরের টিনের চালের ওপর শব্দ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে এল।

লণ্ঠনের শিখাটা একটু বাড়িয়ে দিতে দিতে মণ্ডল বল্‌ল,—আপনিরা জানেন না বাবু, ঝড়ের মধ্যি মত্যার বিলি থাকতি পারে না কেউ। বড় সব্বনাশা বিল। নাও উলট্যা গাড়্যা দেয় জলের মধ্যি। এ রকম অনেক, অনেক দেখিছি বাবু। আর আজ যা প্রেলয়, ঝড়ের দাপট সারা রাতির মধ্যি কমবি নি বল্যা তো মনে হয় না।

সত্যই তখন বাইরে প্রকৃতির রুদ্রলীলা সুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের মাতন, সঙ্গে সঙ্গে এলো-পাথাড়ি জলের ঝাপটা। বৃষ্টির ছাট খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতরেও আসছিল।

ঈশান মণ্ডল উঠে গিয়ে দোরগোড়া থেকে হাঁক দিল,—অই দিদি, এই ঘরে আয় রে। তিন সন ও ঘরের খুঁটি বদলাতি পারি নাই। বাসাতের দাপট বড় বেশি রে আজ।

জল-ঝড়ের শব্দে মণ্ডলের কথা প্রসাদী শুনতে পেল না হয়ত। কোন সাড়া দিল না সে।

দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে তামাক সাজতে বসল মণ্ডল।

একটু পরে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল প্রসাদী। একটি ছোট বেতের কাঠা তার মাথায়, তার ওপর কাঁসার থালা-চাপা। থালার ওপর বঁটিও আছে একখানা।

প্রসাদীর কাপড় সব ভিজে গেছে। ঘরে ঢুকে, দরজায় খিল লাগিয়ে দিল সে।

তারপর মাথার জিনিষগুলো নামিয়ে মণ্ডলকে সে বলল,—কত্তাদা, আজ হুড়ুম ভাজিছিল্যাম। শশা দিয়্যা হুড়ুম খাতি যদি বাবুগরে ভাল লাগে, তাই নিয়্যা অ্যালাম।

মণ্ডল বলল,—আপনিরা কলকাতার লোক, হুড়ুম খাতি কি আপনিগরে ভাল লাগবি নি? কিন্তুক আপনিরা যদি দুটি দুটি খান, পেসাদী বড় খুশী হয়।

অনিরুদ্ধ বলল,—নিশ্চয়ই খাব। এই বৃষ্টিতে শশা-মুড়ি তো আমার খুব ভালই লাগে। আমাদের এমন একটি বোন যে এখানে রয়েছে, তা তো জানতাম না? দাও বোন দাও, আমাদের শশা-মুড়ি দাও। তবে একটা কথা,—আমরা বাবু নই, তোমার ভাই। কেমন, মনে থাকবে এ কথা?

চকিতে প্রসাদী অনিরুদ্ধের চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ।

ঘরের মধ্যে মুড়ি খেতে খেতে সবাই গল্প করছে। ভুল বললাম, গল্প বলছে একা মণ্ডল আর সবাই শুনছে একান্ত আগ্রহে।

ঘরের এক কোণে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে প্রসাদীও শুনছে কত্তাদার অতীত বীরত্বের কাহিনী। সেই সঙ্গে জড়িত রয়েছে এই গ্রামের ইতিহাস আর আজকের জমিদারের পূর্বপুরুষের কীর্তিকলাপ।

গ্রামের জমিদার রায় বাবুদের জমিদারীর সীমানা—পূর্বে মত্যার বিল, উত্তর-পশ্চিমে পদ্মার ত্রিশ মাইল বাঁক। এর মধ্যবর্তী আশী-নব্বইখানা গ্রামের রাজস্বের অধিকারী রায় বাবুরা।

মত্যার বিল পার হয়ে রাইশিমুল, জোরপুকুর—তারপর গাজনার বিল, উত্তরে চলন বিল। এ এলাকার জমিদার দুই চৌধুরীরা। এক চৌধুরী দুলাইয়ের জমিদার—মুসলমান। অন্য জন তাঁতিবন্দরের জমিদার, হিন্দু।

মণ্ডল বলে চলে,—বাবার কাছে শুনিছি, দুলাইয়ের আজিম চৌধুরী আর তাঁতিবন্দরের বিজয় চৌধুরী—দু'জনের বন্ধুত্বাও ছিল যেমনি, আবার রেষারিষিও তেমনি। কেউ কারো চায়ি ছোট হতি চায় না। আজিম চৌধুরী নাকি নিজির নামি টাকার লোট চালাইছিল।

—এ যে বাদশাহি কাণ্ড!

মন্তব্য করল অজয়।

—হয়, তয় আর কতিছি কি? বাদশা কারে কয় দেখি নাই; আজিম বাবুরেও দেখি নাই। সে সময় আমার ঠাকুদ্দা ছিল ল্যাঠ্যাল। বাবাও ছোট। তয় শুনিছি, জাঁকজমক কাণ্ড-কারখানা ছিল আজিম বাবুর বাদশার লাখাল।

একটু দম নিয়ে, হুঁকোতে পর পর কয়েকটি টান দিয়ে আস্তে

আস্তে উদাস সুরে বলল মণ্ডল,—আমিও কি কম ছ্যাখলাম? আমাগরে বাবুরা ছিল এক ছত্তর রাজা। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার কথা শুনিছেন? শরৎবাবুর নামি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খ্যাতো।

—খুব অত্যাচারী জমিদার ছিল শরৎবাবু, তাই না মণ্ডল? প্রশ্ন করল বিভাস।

জিব কেটে মণ্ডল বলল,—ছিঃ ছিঃ, ওনার নামে ওকথা কব্যান না। রাজার মেজাজ না থাকলি কি প্রেজায় মানে? শরৎবাবু ছিল সাড়ে হাত লাম্বা। সুজানগরের হাটের মধ্যি দাঁড়লি, সগগলের মাথার ওপর ওনার মাথা। কাউরে কিছু কত্যান না সহজে, কিন্তুক সিংহের সামনি কিডা যায় সাহস কর্যা? দয়ামায়া ছিল বাবুর, ন্যায্য কথায় মাটির মানুষ। কিন্তুক মিথ্যা কথা, কি ছলচাতুরী করলিই বাবুর কাছে সে ধরা পড়্যা য্যাত, তার আর রক্ষ্যা থাকত না।

—শরৎবাবুর আমলে তুমিই তো লেঠেল সর্দার ছিলে?

প্রশ্ন করল অজয়।

নিতান্ত নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল মণ্ডল,—হয়, ছ্যালাম।

কিছুক্ষণ চপচাপ।

শুধু মণ্ডলের হুঁকো টানার শব্দ। ঘরে সবাই নিঃশব্দ। বাইরে তখনও চলছে অশ্রান্ত জল-ঝড়ের মাতামাতি। এই পরিবেশে গল্প বলার আর শোনার অনুভূতিময় আমেজ—ভাল লাগছে সবার।

মণ্ডল পূর্ব কথার রেশ ধরে আবার সুরু করল,—ল্যাঠ্যাল সর্দার আমি ছ্যালাম ঠিকই, কিন্তুক বাবু আমারে কোনদিন কোন অন্যায় হুকুম ছ্যান নাই।

—দিলে কি করতে মণ্ডল?

এবার প্রশ্ন করল অনিরুদ্ধ।

একটু চুপ করে থেকে মণ্ডল বলল,—আমার বাপ-ঠাকুদ্দা ছিল ল্যাঠ্যাল-সর্দার, তাগরে অমর্য্যদা আমি করি নাই। আমি লাঠি

ধরলি, তিন গেরামের লোক পিছ্যা হট্যা য্যাত। জোয়ানকালে রক্ত ছিল গরম,—বাবু হুকুম করলি ন্যায়-অন্যায় বিচার করত্যাম না। কিন্তুক বাবু আমারে বাঁচাইছে—পাপ কাজ আমার করতি হয় নাই। বাবুর কাকা রামজয় রায়—রাতির বেলা মা-কালীর পূজ্যা কর‍্যা ছিপে উঠত। আমার ঠাকুদ্দা দল-বল নিয়্যা তেনার সঙ্গে য্যাত। তাই কই বাবু, পেতাত্তাগুল্যান বিলির ধারে বাবলা গাছে বাসা বাঁধ্যা আছে। সুযোগ পালিই খাড়া কর‍্যা নাও ডুবায়ে ছ্যায় বিলির পাঁকের মধ্যি। কত যে খুন হইছে, তার কি ঠিক ঠিকানা আছে বাবু? শোধ লেয় তারা। বিলি ভয় আছে বাবু,—মশাল জ্বালায়ে বিলির ওপর দিয়্যা দৌড়াতি দেখিছে তাদের অনেকে। আমিও দেখিছি।

একটু কেসে দম নিল মণ্ডল।

অজয় প্রশ্ন করল,—জমিদার কি ডাকাতি করত?

অজয়ের কথা শুনে মণ্ডলের মুখে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

বলল,—তয়, কল্যাম কি এতক্ষণ? আর ডাকাত ছিল না কিডা? সগ্‌গল জমিদারই ডাকাতি করত। মত্যার বিল, গাজনার বিল, চলন বিল—সগ্‌গল বিলিই ডাকাতি করত তারা। রামজয় বাবুরই ছিপ ছিল চোদ্দখ্যান। সেগুল্যান কানাপুকুরে বাঁধা থাকত। সে সব এখন কিছুই নাই, কানাপুকুরও নাই। পাড়ি ভ্যাঙ্গ্যা সমান হয়্যা গিছে। কানাপুকুর থিক্যা মাতার বিল পর্যন্ত মস্ত জোলা ছিল। জোলা শুকায়ে এখন মধির গাড়ির হালট হইছে। বর্ষাত কাল না হলি, আপনিরা দেখতেন সবই শুকন্যা। মত্যার বিলিও বুক জল—হাঁট্যা হাঁট্যা লোক বিল পার হয়। এখন নাই বাবু, কিছুই নাই—বিল শুকাইছে, বাবুগরে পেরতাপ শুকাইছে, লোক গুল্যানও সব মর‍্যা গিছে। শ্মশান বাবু, মথুরাপুর এখন শ্মশান হয়্যা গিছে।

সখেদে নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করল মণ্ডল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব-কাল ও তারও কিছু আগে বাংলার জমিদারের কথা বর্ণনা করল মণ্ডল।

তারপর কোম্পানীর রাজত্বের অবসানে ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন হ'ল বাংলা। সারা দেশ জুড়ে মাকড়সার মত জাল বিস্তার করে চলল রেল-লাইন। আইন-আদালত বসল, কালেক্টারের অধীন হ'ল জেলা।

সুবিধা না বুঝে, ডাকাতি ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল জমিদাররা। জমিদারীর উন্নতি সাধনায় মনোনিবেশ করল তারা। এই সময়টা বাংলার ইতিহাসে এক স্বর্ণময় যুগ। সুজলা সুফলা বাংলার গ্রাম উৎসবমুখরিত হয়ে উঠল। বারো মাসে তেরো পার্বণের ঢেউ জাগল।

বাংলার সমৃদ্ধি আগেও ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল অরাজকতা। ধনপ্রাণ নিয়ে নির্ভয়ে কেউ বাস করতে পারত না। সে ভয় অনেকটা হ্রাস পেল।

জমিদাররা নিজ নিজ জমীদারীতে বড় বড় দিঘি কাটল। বড় বড় রাস্তা তৈরী করল। পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করল, প্রতিষ্ঠা করল দেবালয়। অনেক কিছুই করল তারা, তার চিহ্ন আজও গ্রামে গ্রামে কিছু রয়ে গেছে।

জমিদার হলেও, আদব কায়দা চাল-চলন ছিল তাদের রাজ-রাজড়ার মত। প্রজারা জমিদারের নামে ভয়ে কাঁপত। দোল-দুর্গোৎসবে পাশাপাশি জমিদারে জমিদারে চলত রেষারেষি। রেষারেষি শুধু জমিদারে জমিদারে নয়, তাদের প্রজাদের মধ্যেও সেটা ছড়িয়ে পড়ত। এই রেষারেষির জন্যে মাঝে মাঝে ছোট-খাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়ে যেত, দু-চারটে খুন-জখমও হ'ত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—খুনের কোন হদিস মিলত না। থানার দারোগাও জমিদারের মন জুগিয়ে চলত।

আজ আর কিছুই নেই। দীঘিগুলো মজে গেছে, রাস্তাঘাট পড়েছে ভেঙ্গে—সংস্কার হয় না। আকাশচুম্বী দোলমঞ্চের ফাটল থেকে অশ্বত্থ গাছ উঠেছে, ভাঁটি আর কাঁটানটের ঝোপে দোলমঞ্চের গোড়া গেছে ঢেকে। কেউটে-গোখরোর নির্বিঘ্ন-আস্তানা হয়ে উঠেছে বহুকাল পরিত্যক্ত সংস্কার-বিহীন জমিদারী ইমারতগুলো।

জমিদারী প্রথার দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়ে, তৃতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছে। অধস্তন জমিদারদের জমিদারীর গ্রন্থি শিথিলতর হয়ে, অধুনা বিলীন হয়ে গেছে। শুধু টাকা নেওয়া ছাড়া প্রজার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আর নেই। জলে ধুয়ে ধুয়ে প্রতিমার সাজ, রং, মাটির প্রলেপ কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু কাঠামোটাই আছে—জমিদারীর কাঠামো। টাকা তৈরীর যন্ত্র।

অনেকক্ষণ'পর রুদ্ধশ্বাসে গর্জন করে উঠল মণ্ডল,—মথুরাপুর শ্মশান হইছে, আর মরার মাংস ছিঁড়্যা খাতিছে শকুনে। বাধা দিবি কিডা? দাঁড়কাকগুল্যান শকুনডার লগে লগে ঘোরে—তার কেপাদিষ্টি পাওয়ার জন্যি।

শকুনডারে আমি চিনি, তার ছোট বেলা থিক্যান। নষ্ট চরিত্তিরের লোক। যোগীর ভিটার ওপর কুসুমের হাত ধর্‌র্যা টানিছিলি শকুনডা। মজুমদার ঘাট থিক্যা সন্ধ্যাকালে জল নিয়্যা ফিরতিছিল তুষ্টু বোরেগীর বিধব্যা মিয়ে কুসুম। যোগীর ভিট্যার চারদিকি জঙ্গল, জন-মুনিষ্যি নাই। শকুনডা বুঝি তক্কে তক্কে ছিল, ক'ন থিক্যা আস্যা দাঁড়াল কুসুমের সামনি। ভয়ে তো কুসুমের কাঁখ্যাল থিক্যা কলসি গেল পড়্যা। শকুনডা ওর হাত চাপ্যা ধরল।

ডাঙ্গিপাড়া থিক্যা বাবুগরে বাড়ি যাতিছিলাম আমি। যোগীর ভিট্যার ওপর ছাখলাম এই কাণ্ড। শকুনডা আমারে দেখে নাই। জোরে এক চড় কসায়ে দিল্যাম শকুনডার গালে। মাথা ঘুরে পড়্যা গেল শকুনডা। তারপর উঠ্যাই দে ছুট।

কুসুমডা ভয়ে ভয়ে তখন কয়,—কাকা কারেও কয়ো না। এ ঘটনা বিশ্বেস করবি না কেউ—আমাক দুন্নাম্ দিবি।

এতদিন কই নাই। আজ কল্যাম। কুসুমডাও মর‍্যা গিছে আজ সাত বছর।

শকুনডার বয়সই বা তখন কত! চোদ্দ-পনের হবি। তার বেশি না। তখন থিক্যাই উড্যার এত শয়তানি। সেই থিক্যান শকুনডা আমাক ভয় কর‍্যা চলত। এখন আমি অথব্ব আর শকুনডার পায়া ভারী। এখন আর ভয় করবি ক্যান?

একটু দম নিয়ে আবার বলল মণ্ডল,—শকুনের পালে তো শকুনই হয়। ওর বাপডাও ছিল ঐরকম—সারাগায়ে ঘা হইছিল। কুষ্ঠ—কুষ্ঠ ছিল নকুড় নাড়ির। নেশাভাঙ্গ আর মেয়েমানষির আদ্দি-ছেরাদ্দ কর‍্যা জমি-জিরাত যা ছিল, সব ফুঁকে দিল নকুড় নাড়ি। বুড়্যাকালে সে কি অবস্থা! হাঁড়ি চড়ে না। এক ছাওয়াল ঐ শকুনডা তো মুখ্যু। শেষতক বুড়্যা করে কি, শকুনডার হাত ধর‍্যা জমিদারের কাছে আস্যা দাঁড়াল। মহীন্দ্রির রায়ের বাপ তখন জমিদার। সেই থিক্যান সেরেস্তায় ফাই-ফরমাশ খাটতি লাগল ঐ শকুনডা। জমিদার বাড়ি থিক্যান সিধ্যা নিয়্যা নকুড় নাড়ির হাঁড়ি চড়ত। টুকটাক লেখা-পড়ার কাজও শিখতি লাগল শকুনডা নায়েব মশায়ির কাছে। শয়তান তো কম না শকুনডা—শিখল খুব তাড়াতাড়ি।

বাবু মারা গেল। কয় বছর পর বৌরাণীও মারা গেল। মহীন্দ্রির রায় শোকডা সামলাতি পারল না। কাজ-কর্ম দেখা ছাড়্যা দিল সব। তখন বিপদের ওপর বিপদ—নায়েব মশাই পাগল হয়্যা গেল। কোন কিছু না, ভাল মানুষডা একেবারে উদ্দম পাগল হয়্যা গেল।

মহীন্দ্রির রায় তখন ঐ শকুনডার হাতে সব ছাড়্যা দিয়্যা একমাত্র মিয়ে নিয়্যা কলকাতা চল্যা গেল।

লোকে কয় শকুনডাই নাকি ওষুধ খাওয়ায়ে নায়েবরে পাগল করিছে। হব্যারও পারে। শকুনডার অসাধ্যি কিছু নাই।

মহীন্দ্রির রায়রে আমি মানা করিছিল্যাম। শকুনডার হাতে নায়েবি দিতি মানা করিছিল্যাম। কিন্তু মহীন্দ্রির রায় আমার কথা শোনে নাই। কইছিল, কাজ ভালই শিখিছে ও। ঠিকই করতি পারবি সব।

তখন সব কথা কব্যার পারি নাই। আজ মহীন্দ্রির রায়রে পালি কত্যাম—কাজডা ও কেমন শিখিছে?

—কেন, জমিদারবাবু কিছু জানেন না এসব কথা?

প্রশ্ন করল অনিরুদ্ধ।

—মহীন্দ্রির রায় আজই স্যান জমিদার। কিন্তুক আমি তো তারে চিনি—তার বাপের আমলের লোক আমি। তুচ্ছ কথায় কান ছ্যায় না সে। মনডা বড় উঁচু। সব কথা সে জানে না। জানলি, একটা বিহিত হবিই। ঐ শকুনডা কি সোজা শয়তান! দাঁড়কাকগুল্যানও হইছে তেমনি। শুধ্যা শ্মশান হলি ভাল হত, এ জায়গা হইছে ঠিক নরক। সে সব অনেক কথা। আপনিরা দু'চারদিন থাকলি, কিছু কিছু জানতি পারবেন। যাগগে—উ সব ভাগাড়ের কথা। বিষ্টিটা বুঝি একটুন ছ্যাঁক দিছে। পেসাদি, বাবুগরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা লাগে।

প্রসাদী এতক্ষণ শুধু গল্পই শোনে নি, অতিথিদের খাবার ব্যবস্থাও সে এর মধ্যে উঠে গিয়ে করে রেখেছে। প্রসাদী বলল,—আমি মান আর আলু ভাতে দিয়্যা ভাত চড়ায়ে দিছি। তুমি খানকয় পাতা কাট্যা দাও কত্তাদা।

প্রসাদীর কথা শেষ হতেই সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল,—না না, আর কিছু খাব না। এই তো মুড়ি খেলাম।

বিনয়ের হাসিতে ঈশান মণ্ডলের মুখ ভরে উঠল। বলল,—সে কি কথা! আপনিরা আমার অতিথ, আমার যা আছে তাই

দিয়্যা আপনিগরে সেবা করব আজ। গেরস্ত ঘরে অতিথ কি উপ্যাস থাকে বাবু? যা রে পেসাদি, ভাতের কদ্দুর ছাখ্। আমি খানকয় পাতা কাট্যা নিয়্যা আসি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মণ্ডল। প্রসাদীও গেল তার পেছন পেছন।

নিরর্থক ভেবে তাদের আর বাধা দিল না কেউ।

মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে ঈশান মণ্ডল বলল,—আমাগরে হাতে জল চলে। তা না হলি কি আপনিগবে নিজি হাতি খাওয়াতি সাহস করি?

লজ্জিত হয়ে অনিরুদ্ধ বলল,—জল না চললেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সত্যিই আমাদের খিদে নেই। এসব হাঙ্গামার আর দরকার ছিল না।

বিস্ময়ের সুরে মণ্ডল বলল,—হাঙ্গামা! আপনিগরে বাড়ী অতিথ গেলি কি আপনিরা হাঙ্গামা ভাবেন নাকি?

আবার কি কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মণ্ডল।

বৃষ্টিতে ভিজে অতিথি-সেবার আয়োজন করছে অশীতিপর বৃদ্ধ আর তার ছেলেমানুষ নাতনী। তাদের আন্তরিকতার মধ্যে কোন খাদ নেই। নিজেদের মন নিয়ে জগৎকে তারা দেখে। তাই মণ্ডল বলল,—বাড়ীতে অতিথি এলে হাঙ্গামা ভাবে না কেউ।

অনেকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে অনিরুদ্ধকে। বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা। অবাক হয়ে সে ভাবতে লাগল—প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি আজও বেঁচে আছে এই সব অক্ষরজ্ঞান-বিবর্জিত, দরিদ্র, সরল গ্রাম্য লোকদের মধ্যে।

তিন

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেল অনিরুদ্ধের। বিভাস, অজয় আর অনিল সবাই ঘুমুচ্ছে। ওদের চার জনকে এ ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছে মণ্ডল। মণ্ডল আর প্রসাদী শুয়েছে অন্য ঘরে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অনিরুদ্ধ।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। জ্যোৎস্নাও ফুঠেছে। আধখানা চাঁদ আকাশের কোলে ঢলে পড়েছে।

কাল রাতে এত যে ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল, আকাশের দিকে তাকালে বিশ্বাসই হয় না। চমৎকার জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে।

ঘরে গিয়ে আর ঘুমুতে ইচ্ছে করল না অনিরুদ্ধের। দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল।

বাড়ির কথা, বিশেষ করে সীতার কথা মনে পড়ল তার। আসবাব সময় সীতার সঙ্গে দেখা হয় নি, সীতা তখন কলেজে ছিল।

সীতা ভাবে তার জন্যে। সীতা বাড়িতে থাকলে, সে তাকে বলে আসত। নিজের ঘরে টেবিলের ওপর ছোট্ট একখানা চিঠি সে রেখে এসেছে সীতার জন্যে। সীতা ছাড়া আর কেউ তার ঘরে ঢোকে না। চিঠিখানা সে নিশ্চয়ই পাবে।

মাতৃ-হারা বোন সীতা। সংসারে ঐ বোন ছাড়া অনিরুদ্ধের আর কোন আকর্ষণ নেই, বন্ধনও নেই।

পিতাকে সে এড়িয়ে চলে। অবিনাশবাবুও পুত্রের উপর বিরক্ত। আর নূতন-মা? তাকে ভাল করে দেখেইনি অনিরুদ্ধ। তার সম্বন্ধে কোন কৌতূহলও অনিরুদ্ধের নেই।

মাস সাতেক আগে বোম্বাইতে গিয়েছিল সে একটি বিশেষ কাজে। ফিরতি পথে নাগপুর আর অন্য দু' এক জায়গায় কাজ সেরে মাস খানেক পরে সে বাড়ী ফিরল। কিন্তু তার এই

অনুপস্থিতির মধ্যে বাড়ীতে অনেক কিছু অদল-বদল হয়ে গেছে। পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন।

বছর কয়েক আগে তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। নূতন করে সেদিন মায়ের কথা মনে পড়ল অনিরুদ্ধের। চোখের কোণটাও বুঝি তার চকচক করে উঠেছিল। গা ঝাড়া দিয়ে কাজের মধ্যে ডুব দিল সে।

সীতা কিন্তু পিতাকে প্রত্যক্ষ অনুযোগ করেছিল। উত্তরে অবিনাশবাবু বলেছিলেন, তোমরা দুই নাচুনে ভাই বোন যদি মানুষই হতে, তবে এই বয়সে আমায় আবার সংসার ঘাড়ে করতে হয় ?

এ কথার উত্তরে সীতা অনেক কিছু বলতে পারত, কিন্তু পিতার সঙ্গে তর্ক করতে তার প্রবৃত্তি হয় নি।

লেখা-পড়া শিখে অনিরুদ্ধ কোন চাকরি-বাকরি করল না, দিনরাত হুজুগে মেতে হৈচৈ করে বেড়াতে লাগল। অবিনাশবাবু এতে পুত্রের উপর বিরূপ হয়ে উঠলেন। অনিরুদ্ধ পিতার মনোভাব জানত। তাঁকে এড়িয়ে চলত সে।

ইদানীং সীতার উপরও অবিনাশবাবু সন্তুষ্ট ছিলেন না।

সীতাকে কলেজে পড়ানো অবিনাশবাবুর ইচ্ছা ছিল না। সীতা জোর করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সীতার ওপর তাঁর বিরূপতার সেও এক কারণ। আর এক কারণ, সীতাকে কোন সময় বাড়িতে পাওয়া যায় না। যখন বাড়ীতে ঢোকে, সঙ্গে নিয়ে আসে এক পাল মেয়ে। অবিনাশবাবু এ সব পছন্দ করেন না। তারপর একদিন পতাকা হাতে সীতাকে এক ছাত্র-মিছিলের সঙ্গে যেতে দেখে, অবিনাশবাবু খুব চটে গেলেন।

পুত্র-কন্যার সঙ্গে অবিনাশবাবুর যোগ খুব ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পর, সম্বন্ধ আরও ক্ষীণতর হয়ে উঠল। এক বাড়িতে বাস করেও পিতা-সন্তানে সাক্ষাৎ হ'ত না।

কিন্তু মজা এই, পিতার সঙ্গে মনান্তর ঘটলেও নূতন-মার সঙ্গে আশ্চর্য রকম ভাব হয়ে গেল সীতার।

নূতন-মার প্রশংসায় সীতা পঞ্চমুখ।

অনিরুদ্ধ ভাবে নূতন-মা হয়ত লোক ভাল। না হলে, সপত্নীকন্যা সীতার প্রশংসা পেত না।

অনিরুদ্ধ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, নিজের ঘরে কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে। বাড়ির বিষয়ে কোন খবর সে রাখে না। রাখতে চায়ও না।

সীতা ছাড়া, অন্য কেউ তার ঘরে ঢোকেও না। সীতার মুখে মাঝে মাঝে সাংসারিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর সে পায়। যতটুকু সীতা বলে, ততটুকু। তার বেশী কিছু জানবার কৌতূহল তার নেই। সে বিষয়ে সীতাকে কোন প্রশ্নও সে করে না কোনদিন।

সীতাব সঙ্গে নূতন-মার খুব ভাব। কিন্তু অনুরুদ্ধের সঙ্গে নূতন-মার আজ পর্যন্ত একটা কথাও হয় নি। দেখাও হয় নি তাদের।

সীতার সঙ্গে ভাব হবার পর, সীতা একবার চেষ্টা করেছিল দাদার সঙ্গে নূতন-মার আলাপ করিয়ে দেবার। নূতন-মা আলাপ করতে চায় নি। বলেছিল, লজ্জা করে।

যতক্ষণ অনিরুদ্ধ বাড়িতে থাকে, অনিরুদ্ধের সামনে নূতন-মা বেরোতে চায় না, তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সীতা নূতন-মাকে জানে, অনিরুদ্ধের সম্বন্ধে তার মনে যে কোন বিবদ্ধ ভাব নেই, তা বোঝে।

এ সব ব্যাপার অবশ্য অনিরুদ্ধ জানে না।

সীতার মুখে শুনে শুনে নূতন-মা সম্বন্ধে তার একটা ধারণা আছে, লোক সে ভাল।

আট-দশ দিন হয়ে গেল সে এখানে এসেছে। সীতা হয়ত তার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এখানকার ঠিকানা সীতা জানে না। এখানে যে তারা এসে পড়বে, এ কথা অনিরুদ্ধই কি আগে জানত!

হয়ত বেশ কিছুদিন এখানে তাদের থাকতে হবে। সীতাকে জানানো দরকার। না হলে, সীতা অনর্থক দুশ্চিন্তা ভোগ করবে।

কালই তাকে এখানকার সব অবস্থা জানিয়ে চিঠি দেবে ঠিক করল অনিরুদ্ধ।

তারা যে এখানে এসে পড়েছে, সেও কতকটা আকস্মিকভাবে।

প্রথমতঃ উত্তর-বঙ্গে প্রবল বন্যার খবর তারা কাগজে পড়ে। বন্যার দরুণ লোকের দুঃখ-দুর্দশার কথাও কিছু কিছু কাগজে বের হয়।

কলকাতায় বসে তারা 'রিলিফ প্রোগ্রাম' ক'রে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে উত্তর-বঙ্গে 'রিলিফ' করতে বের হয়। শান্তাহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, পার্ব্বতীপুর, রাজসাহী, পাবনা—খবর কাগজ পড়ে প্রত্যেক জায়গায় এক একটি দল রওয়ানা হয়। উত্তর-বঙ্গ সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা কিছু নেই—কোন দিন তারা উত্তর-বঙ্গের শহর বা গ্রামে আসে নি। টাইম-টেবিল দেখে,—স্টেশনের নাম পড়ে গন্তব্য-স্থল ঠিক করেছে তারা।

পাবনার দিকে 'রিলিফ' করতে বেরিয়েছিল অনিরুদ্ধেরা চারজন।

ঈশ্বরদি ষ্টেশনে নেমে, লোককে জিজ্ঞাসা করেও তারা জানতে পারল না সত্যিকারের বন্যাটা কোথায়। সঠিক কেউ কিছু তাদের বলতে পারল না। কেউ বলে, পদ্মা দোগাছিতে ভাঙ্গছে; কেউ বলে, হিমাইতপুরের কাছে ভাঙ্গছে। সাতবাড়িয়ার ঘাট ভেঙ্গে গেছে—নিশ্চিন্দপুরের গোলা ভেঙ্গে পদ্মা কাদোয়ার কাছে সরে এসেছে, এ খবরও তারা পেল। কিন্তু কোথায় যে তাদের যাওয়া উচিত, বুঝে উঠতে পারল না অনিরুদ্ধেরা।

অনেকে পরামর্শ দিল, পাবনা শহরে যান। সেখানে গেলেই সব হদিশ পাবেন।

ঈশ্বরদি স্টেশন থেকে আঠারো মাইল বাসে করে আসতে হয় শহর পাবনায়।

পাবনা এসে যখন তারা পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

বন্যা বা পদ্মার ভাঙ্গন নিয়ে শহরে কোন চাঞ্চল্য দেখতে পেল না তারা। ভাবল, হয়ত ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল সবাই।

রাতের আস্তানার জন্যে খোঁজ-খবর করে সাগর পাণ্ডার হোটেলে গিয়ে উঠল তারা।

হোটেলে তারা বন্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর শুনল।

সাতবাড়িয়ার অক্ষয় পোদ্দার সেদিন সাগর পাণ্ডার হোটেলে ছিল। আদালতের কাজে সে শহরে এসেছিল। অনিরুদ্ধদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে অক্ষয় পোদ্দার হেসে ফেলল। বলল,—চার বন্ধুতে মিলে আপনারা পদ্মার ভাঙ্গনে 'রিলিফ' করতে এসেছেন? পদ্মাকে আপনারা জানেন না, তার ভাঙ্গনের সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় নেই। শান্তাহার, রংপুরের দিকে প্লাবন হয়েছে শুনেছি, সেদিকে গেলেও কিছু কাজ করতে পারতেন হয়ত।

—সেখানেও আমাদের সংঘের লোক গিয়েছে।

অনিরুদ্ধ বলল।

—বেশ, তা যখন এসেই পড়েছেন, কিছু না কিছু কাজ পাবেন বৈকি! পদ্মা ভাঙ্গছে বটে, তবে সে রকম কিছু নয়। আমাদের ওদিকে সামান্য ভেঙ্গেছে, দোগাছিতেও অল্প অল্প ভাঙ্গছে। আপনাদের করবার মত কিছুই নেই এতে। আর পদ্মার সত্যিকারের ভাঙ্গন সুরু হলেও, আপনাদের কিছু করবার থাকত না।

—কেন?

প্রশ্ন করল বিভাস।

অল্প একটু হেসে ভদ্রলোক বলল,—তাই তো বলছিলাম, পদ্মার ভাঙ্গনের সঙ্গে আপনাদের কোন পরিচয় নেই। পদ্মার ভাঙ্গন চোরা, আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। তারপর হঠাৎ গ্রামকে গ্রাম ধ্বসে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আপনাদের একটা গল্প বলি শুনুন, তাহলে পদ্মার ভাঙ্গনের সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ধারণা হবে।—

'বছর ত্রিশেক আগে পদ্মা একবার ভাঙ্গতে শুরু করে। রোজই শোনা যেতে লাগল, অমুক হাট ভেঙ্গে গেছে, অমুক গ্রামের কোন চিহ্ন নেই। পাবনা জেলার আশ-পাশ দিয়েই সেবার ভাঙ্গনের জোর খুব বেশি। পদ্মা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পাবনা শহরের খুব কাছে এসে গেল। শহরের লোক সব শঙ্কিত হয়ে উঠল। শহর এই যায়, সেই যায় অবস্থা! বড় বড় পাথর তারের জালে বেঁধে, এমব্যাঙ্কমেণ্ট তৈরী করে শহর রক্ষার চেষ্টা চলল।

সে সময় পাবনার বিখ্যাত বড়লোক ছিল ট্যানা বাগচি। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ আর ট্যানা বাগচি—দুইজনেরই নাকি ফ্রান্স থেকে কাপড় ধুয়ে আসত। সত্যি মিথ্যে জানি না,—আমরা গল্প শুনেছি। তবে ইটালি থেকে পাথর আর মিস্ত্রি এনে ট্যানা বাগচি যে বাড়ী তৈরী করেছিল, সে বাড়ী আমি দেখেছি। আগা-গোড়া পাথর দিয়ে মোড়া, আর পাথরই বা কত রকমের!

পাবনার জেলা স্কুলে পড়তাম আমরা। বোর্ডিংএ থাকতাম। বিকেলে দল-বেঁধে আমরা অনেকে ট্যানা বাগচির বাড়ী দেখতে যেতাম। সত্যিই দর্শনীয় ছিল সে বাড়ী। গাল-পাট্টা পশ্চিমে দরওয়ান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাত আমাদের। আমরা ছোট ছিলাম, তাই বাড়ীর ভেতরেও আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল।

বাড়ীটা ছিল শহরের বাইরে, শহর থেকে অনেকটা দূরে।

একদিন খবর শুনলাম, পদ্মা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নাকি ট্যানা বাগচির ফুলের বাগান পর্যন্ত এসে গেছে।

তারপর খবর পেলাম, ট্যানা বাগচির বাড়ী থেকে গরম গরম জিলিপী ভেজে ধামায় ধামায় পদ্মায় ঢালা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, পদ্মা-দেবীকে সন্তুষ্ট করা, যাতে তিনি তাঁর বাহু আর বিস্তার না করেন। কিন্তু কোনরকম নোটিশ না দিয়েই একসময় সমস্ত বাড়ীটা আস্তে আস্তে নীচের দিকে বসে যেতে লাগল। বাড়ীতে লোকজন যারা ছিল, প্রাণভয়ে বেরিয়ে পড়ে শহরের দিকে ছুটতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যানা বাগচির বাড়ীর কোন চিহ্নও আর দেখতে পাওয়া গেল না। সেখানে শুধু জল আর জল থই থই করছে, পদ্মার স্রোত গর্জন করে বেয়ে চলেছে।

না, ট্যানা বাগচি মরে নি। মরলেই বুঝিবা ভাল ছিল। নিঃস্ব ভিখিরী হয়ে শেষ জীবন তার অতি দুঃখে কেটেছে। শুধু পরিবারের লোকগুলোর জীবন ছাড়া পদ্মা আর সবই তার নিয়ে গিয়েছিল।'

গল্প শেষ করে পোদ্দার মশায় বলল,—এখন বুঝতে পারছেন, সত্যিকারের পদ্মার ভাঙ্গন কি?

তাদের উত্তরের কোন অপেক্ষা না করেই পোদ্দার মশায় আবার বলল,—পদ্মা এবার যত ক্ষতি না করুক, যমুনার জল ফেঁপে উঠে সব ভাসিয়ে দিয়েছে। গাজনার বিলের সঙ্গে রয়েছে যমুনার যোগ। গাজনার আশ-পাশের গ্রাম সব ভেসে গেছে যমুনার কালো জলে। হয়ত সেখানে আপনাদের করবার অনেক কিছু রয়েছে। কাল চলুন না আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে?

অনিরুদ্ধ বলল,—আপনার বাড়ী কি ওদিকে?

—ঠিক ওদিকে নয়, পদ্মার কাছে। তবে ওদিক থেকে বেশী দূরেও নয়। যমুনা আর পদ্মার মাঝে আমরা বাস করি। দূরত্ব বেশী নয়।

—বেশ, আপনার সঙ্গেই কাল যাব আমরা।

পরদিন পোদ্দার মশায়ের নৌকাতেই অনিরুদ্ধেরা সাতবাড়িয়া গিয়ে পৌঁছল।

পোদ্দার মশায় লোক খুব ভাল, অমায়িক। অতিথিদের যথেষ্ট সমাদরের ত্রুটি হল না। কয়েকদিন তার বাড়ীতে থেকে যেতেও বিশেষ অনুরোধ করল পোদ্দার মশায়। কিন্তু পীতাম্বর মাঝির কাছে

তাদের গ্রামের অবস্থা শুনে, অনিরুদ্ধেরা সেখানে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পোদ্দার মশায়ের কাছে বিদায় চাইল তারা।

পীতাম্বরকে তারা সাতবাড়িয়ার ঘাটে দেখেছিল। পীতাম্বর পোদ্দার মশায়ের পরিচিত লোক। পীতাম্বরকে পোদ্দার মশায় তাদের গাঁয়ের খবর জিজ্ঞাসা করেছিল। তাতে পীতাম্বর মাঝি যা বলল, তাতে অবস্থা সত্যই শোচনীয়।

পীতাম্বরের মুখে জানা গেল, জল রোজই বেড়ে চলেছে। গাজনার বিল, মত্যার বিল, পদ্মবিলা, বকচর ভেসে গেছে। ডাঙ্গিপাড়ার অনেক গেরস্ত বাড়ির মধ্যেও জল ঢুকে পড়েছে। ডাঙ্গিপাড়া, বলরামপুর, নারায়ণপুর সব জলে জলময় হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট নেই। ছোট ডিঙ্গি বা কলাগাছের ভেলা তৈরী করে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত, হাটবাজার করে লোকে। মথুরাপুরেও জল ঢুকেছে। মথুরাপুরে শুধু বাবুদের পাড়াটা জেগে আছে এখনও। বাবুদের পাড়ায় জল ঢোকে না সহজে। বিলের দিকে গাঁগুলো গড়ান জমিতে, তাই জল বাধা পায় না। বাবুদের পাড়া শেষের দিকে, জমিও উঁচু অনেক।

পীতাম্বর মাঝির গহনার নৌকা কোনদিন বা সাতবাড়িয়ার ঘাটে, কোনদিন বা পাবনার ঘাটে ভাড়া নিয়ে যায়। নৌকাখানা তার নিজেরই। নিজেই নৌকার মাঝি। আরও দুজন লোক খাটে নৌকায়, তারা অংশ পায়। গহনার নৌকা ছাড়া, ডিঙ্গিও তার আছে একখানা। যেদিন ভাড়া থাকে না, ডিঙ্গি করে মাছ মারে পীতাম্বর। পীতাম্বরের অবস্থা খুব খারাপ নয়।

লোকও সে ভাল। বাবুরা তাদের গাঁয়ে যাচ্ছে শুনে খুসী হয়ে সে বলল,—চলেন বাবুরা, যায়্যা দেখবেন-অনে কি অবস্থা!

—হ্যাঁ, যাব বই কি, তা কত ভাড়া নেবে?

অনিরুদ্ধের কথায় বিনীতভাবে জানাল পীতাম্বর,—ভাড়া নিব না। আপনিরা যাতিছেন, এই তো আমাগরে ভাগ্যি। আর গাঁয়ে তো আমার ফিরতি হবিই—তয়, ভাড়া কিসির ?

—না, না, তা হয় না। ভাড়া তোমাকে নিতেই হবে।

অনিরুদ্ধ জোর করল।

—আচ্ছা সে পরে দেখা যাবি নি। এখন নাওয়ে ওঠেন।

পথে কথায় কথায় পীতাম্বরের কাছ থেকে তাদের গাঁয়ের খবর সংগ্রহ করল অনিরুদ্ধ।

বর্ষাকালে এদিকে যমুনার জল আসে। গাজনার বিলের পরই যমুনা নদী। একদিকে পদ্মা, অন্যদিকে যমুনা পাবনা জেলার এ অংশটাকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে আছে।

খাল বিল পার হয়ে ঢালু জমিতে যমুনার জল সহজে ঢুকে পড়ে। অন্য দিকটা অপেক্ষাকৃত উচু, তাই পদ্মার জল বেশি বর্ষা না হলে ঢুকতে পারে না।

কোন কোন বার পদ্মা-যমুনা দুইই ভাসিয়ে দেয় মাঝের এ জনপদকে। কোনটা পদ্মার জল আর কোনটা যমুনার জল বুঝতে কষ্ট হয় না। পদ্মার ঘোলা জল আর যমুনার কালো জলে মিশ খায় না। এমন কি, যেখানে দুটোর জল মিশে গেছে—একটা সমান্তরাল রেখা দুটোর পার্থক্য স্পষ্ট করে রাখে।

পদ্মা কিছু কিছু ভাঙ্গছে বটে, তবে যমুনা ফেঁপে উঠে এবার ক্ষতি করেছে বেশি। ধান-পাট ডুবে গেছে, বাড়ি-ঘরের অবস্থাও শোচনীয়। মাটির ঘর, বাঁশের বেড়ার দেওয়াল, মাটি দিয়ে লেপা। জলের মধ্যে তার অস্তিত্ব কদিন টিকবে ? ধ্বসে যাচ্ছে ঘরগুলো।

সামনে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, এখন থেকেই অনেকের অনাহার চলছে। থাকবার স্থানও অনেকের নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিবেশীর বাড়ি

এসে তারা আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু সে আশ্রয়স্থানও নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে তাও ধ্বসে যাবার আশঙ্কা আছে।

এত দুঃখ, এত বিপদ—কিন্তু জমিদারের ভ্রূক্ষেপ নেই।

জমিদার এখানে থাকে না, তার নায়েবের ওপর দেখা-শোনার ভার। হাল-সন শোধ করে খাজনা দিতে হবে, 'নাড়ি মশায়ের' হুকুম।

সব শুনে অনিরুদ্ধ বলল,—আচ্ছা, পীতাম্বর, তোমাদের গাঁয়ে গিয়ে আমরা থাকব কোথায় ?

—ক্যান, বাবুগরে কাছারিতে থাকবেন। নায়েব মশায়কে কলিই ঘর খুল্যা দিবি নি।

—না, পীতাম্বর, কাছারিতে আমরা থাকবো না। আর কোথায় থাকা যায় বল ত ?

—থাকার যাগার কি অভাব ? তয়, আপনিগরে কষ্ট হবি।

—আমাদের কষ্ট একটু হলই বা। তোমরাও তো কত কষ্টে রয়েছ।

—আমাগরে কথা ছাড়ান দ্যান বাবু। আমরা কি মানুষ!

—আমিও যেমন মানুষ, তুমিও তাই। নিজেকে অত ছোট ভাব কেন ?

—কি যে কন ? আপনিগরে সাথে তুলনা হয় নাকি আমাগরে ? সে যাউকগ্যা—আপনিগরে থাকার ব্যবস্থা আমার গরীবের ঘরেই হবি নি। তয়, জল য্যামন বাড়তিছে, আমার ঘরখ্যান কবে যে পড়্যা যাবি, কব্যার পারিন্যা।

—তুমি খুব ভাল লোক পীতাম্বর। ভাই, তোমাকে একটা অনুরোধ করব। তোমার নৌকাতে ক'দিন থাকা যায় না ? দৈনিক ভাড়া দেব।

জিব কেটে পীতাম্বর বলল,—ভাড়ার কথা কয়্যা লজ্জা দ্যান ক্যান বাবু ? বেশ, ডিঙ্গিখ্যান দেবনে ঠিক কর্যা, তাতিই থাকবেন আপনিরা। কিন্তু সে যে বড় কষ্ট হবি বাবু ?

—না, না, কষ্ট আর কি। তুমি একটু খোঁজ-খবর নিও, তাহলেই হবে।

পীতাম্বর যা বলেছিল, অনিরুদ্ধেরা দেখল তার এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। যমুনার কালো জল থৈ থৈ করছে চতুর্দিকে।

পীতাম্বর অনিরুদ্ধদের সব ব্যবস্থা করে দিল। সুন্দর করে ডিঙ্গিখানায় আচ্ছাদন দিয়ে দিল পীতাম্বর। ডিঙ্গি হলেও, বেশ বড়। চারজনের বিশেষ অসুবিধা হ'ল না তাতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে-বসে থাকতে। চাল-ডাল, নুন-তেল, তোলা উনুন সব ব্যবস্থাই পীতাম্বর করে দিল খুসী মনে।

পরদিন পীতাম্বর গাঁয়ের লোকের বাড়ী বাড়ী নিয়ে গেল তাদের। কারো কারো বাড়ীর দাওয়ায় গিয়েই তাদের ডিঙ্গি ঠেকল। এমন অবস্থা, জল আর একটু বাড়লেই, তাদেরও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

এই বিপদের মধ্যে লোকে আরও উদ্বিগ্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নায়েবের অত্যাচারে। খাজনা কিছুতেই মকুব হবে না— নায়েবের এক কথা।

অনিরুদ্ধ দেখল, প্রকৃতির ভয়ঙ্করী-রূপকে তারা তত ভয় করে না, যত ভয় করে নায়েবকে। তার কারণ হয়ত এই যে, জল বাড়ছে—কমেও যাবে একদিন। আবার হাত-পা মেলে তারা বসতে পারবে। কিন্তু নায়েবের রোষবহ্নিতে জমিজমা, ভদ্রাসন চলে গেলে —খাবার সংস্থান, মাথা গুঁজবার ঠাঁই কিছুই থাকবে না।

নায়েবকে ভয় করে না শুধু ঈশান মণ্ডল।

জমিদারের দেওয়া নিষ্কর জমিতে বাস করে বলেই যে, ঈশান মণ্ডল নায়েবকে ভয় করে না—তা নয়, লোকটার এককালে শক্তি ছিল, মনে তেজও ছিল। অঙ্গারশকটি আজও হয়ত তার উত্তপ্ত

রয়েছে—কিন্তু উত্তপ্ত ভস্ম শুধু নিজের অক্ষমতার গ্লানিতেই ভরপুর হয়ে ওঠে, জ্বালিয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই।

অনিরুদ্ধ তখনও একইভাবে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

বেশ ফর্সা হয়ে গেছে।

প্রসাদী কখন যে উঠে উঠোন ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছে অনিরুদ্ধ বুঝতে পারেনি।

তখনও আর কেউ ওঠেনি।

প্রসাদী আজ সহজভাবেই অনিরুদ্ধের সঙ্গে কথা বলল,—মনে কয়, কাল আপনির ঘুম হয় নাই ভাল। কখন থিক্যা উঠ্যা বসিছেন ওখানে ?

—না, ঘুম ভালই হয়েছে আমার। শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তাই এখানে এসে বসেছি।

—অন্ধকারে দাওয়ার কোলে পা ঝুলায়ে বসব্যার নাই। বষাৎ কালি লতার ভয় বেশী।

—লতা ?

—হ্যাঁ, মা মনসা।

ঝাঁটা শুদ্ধ হাত দুটো কপালে ঠেকাল প্রসাদী।

হেসে উঠল অনিরুদ্ধ।

বলল,—বেশ, আর বসব না।

বৃদ্ধ মণ্ডল ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল,—কি, কয় কি দিদি ?

—প্রসাদী বলছিল, বর্ষাকালে সাপের ভয় আছে এখানে।

—তা ঠিকই কইছে। জলে ভরে গিছে চারদিক, জল-জঙ্গলের আবাস ছাড়্যা সাপ এখন ঘরে উঠবি। কিন্তুক, আপনি ক'লেন কি, 'পরসাদী' ? সোন্দর কথা আপনিরা সোন্দর কর‍্যা কব্যার পারেন।

নামডা রাখিছিল উয়্যার বাপ। সোন্দর নাম। কিন্তুক মুখ্যু মানযির মুখি কি তা ওচ্চারণ হয়? উয়্যার বাপ যে লেখাপড়া জানত। মাখন পণ্ডিতির পাঠশালির পড়া শেষ করিছিল। মিয়েকেও দিছিল পাঠশালি। মিয়ের পড়াডা শেষ দেখব্যার পারল না সে। গেল—বুড়্যার বুকখ্যান গুঁড়্যা কর্যা দিয়্যা চল্যা গেল। সিবার মড়ক লাগছিল। বাপ গেল, মা গেল,—বুড়্যার সংসারে আগুন লাগায়ে দিল বাবু। শোকি আমাক বুড়্যা করিছে;—বয়সি আর কতটুন করিছে? সে শোকডা সহ্য কর্যাও বাচ্যা আছি, বাবু। আরও কপালে কত দুঃখু আছে কিডা জানে?

সকাল বেলাতেই এই দুঃখের কাহিনীতে বৃদ্ধের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদীরও। চোখ দুটো তার ছল-ছল—হয়ত আর বাঁধ মানবে না।

অনিরুদ্ধ এ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল,—প্রসাদী তাহলে লেখাপড়াও জানে! বাঃ! আমার বোনটির দেখছি অনেক গুণ।

প্রশংসায় লজ্জা পেল প্রসাদী। তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে উঠোন ঝাঁট দিতে সুরু করল।

মণ্ডল বলল,—আর এক বছর হলিই উয়্যার পাঠশালির পড়া শেষ হত। পেসাদির মাথা খুব পরিষ্কার। পণ্ডিত একদিন আমাক ডাক্যা কয়,—মণ্ডল, তোমার নাতনীর মাথা বড় ভাল। শুন্যা বড় আনন্দ হইছিল বাবু। উয়্যার বাপের মাথাও ছিল খুব পরিষ্কার। আমার ইচ্ছে ছিল, পাঠশালির পড়াডা উয়্যার শেষ হক। কিন্তুক তা হল না। মিয়ে বড় হইছে। পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়, সেই থিক্যান পাঠশালি যাওয়া বন্ধ হল।

বৃদ্ধের কথা শুনে অনিরুদ্ধ বলল,—প্রসাদী যদি চায়—যে কদিন আছি, আমি ওকে পড়াব।

—ইডা তো খুব ভাল কথা। বেশ, পড়বিনি, আপনি পড়াবেন।

প্রসাদী কিন্তু ওজর দেখিয়ে বলল,—আমি পড়ব কখন? ই সব তালি করবি কিডা?

অনিরুদ্ধ বলল,—সবই তুমি করবে, আবার পড়বেও। আমার কাছে পড়ার বই নেই। শুধু মুখে মুখে গল্প শুনে শিখবে পড়া। সে পড়া মুখস্থ করতে হবে না।

মণ্ডল বলল,—ডাক্তারবাবুর বাপ কাগজ পড়ে শোনায়। ছ্যাশ-বিদ্যাশের কত কথা কয়। কত সব আশ্চয্যি গল্প। আচ্ছা বাবু, হিমালয় পব্বতির মাথায় নাকি লোক উঠতিছে? কি দরাজ সাহস লোকগুল্যানের, মরার তোয়াক্কা করে না। কত সব আশ্চয্যি কথা কয় মজুমদার মশায়। সব নাকি সত্যি। চাঁদের মধ্যি নাকি গাছ পাহাড় সব আছে, মঙ্গল গ্রহে নাকি লোক থাকে।

—হ্যাঁ, অনেক কথাই যা আজ আমাদের আশ্চর্য মনে হচ্ছে, কিছুদিন পর দেখা যাবে তা মোটেই আশ্চর্য নয়। বহুপূর্বে ঠিক এখনকার মতই লোক নূতন কিছু তথ্য আবিষ্কার করে অন্য সবাইকে আশ্চর্য করে দিত। কিন্তু সে তথ্যের কথা শুনলে, আজ আমাদের হাসিই পাবে—মোটেই তাতে আর আমরা আশ্চর্য হই না। এমনি ভাবেই পৃথিবী এগিয়ে চলেছে নূতন থেকে নূতনতর অজানার সন্ধানে।

—আচ্ছা, আপনি গল্প করে কব্যান, আমিও শুনবোনে। শুন্যা কত কি জানা যায়। আর, আমরা তো মুখ্যু মানুষ, কিছুই জানিন্যা।

—বেশ, সন্ধ্যায় আমরা বসব। এখন একবার বাবুপাড়া যেতে চাই যে মণ্ডল।

—ক্যান?

—এখানে ক'দিন এসেছি, বাবুদের সাথে আলাপ হল না এখনও। ভাবছি তাদের সঙ্গে আজ পরিচয় করে আসি।

—তা বেশ, চলেন।

—জল কি বাড়ল আজও?

—তা তো বাড়বিই, কাল এত বিষ্টি হল।

ইতিমধ্যে আর সবাই উঠে পড়েছে। সবাই একে একে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

মণ্ডল বলল,—তা হলি আপনারা হাত-মুখ ধোন। সকালেই বারায়ে পড়ি। চলেন, জল তুলে দিই।

কুয়ো-তলায় সবাই হাত-মুখ ধুচ্ছে। অনিরুদ্ধ যায় নি। তখনও সে দাওয়ায় বসে।

প্রসাদীকে বলল,—আমাব কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে, প্রসাদী ?

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাব দিকে তাকাল প্রসাদী ?

—একটু জল গরম কবে দিতে হবে তোমাকে।

—তা দেবনা ক্যান ? কি করবেন গরম জল দিয়া ?

—চা কবব।

—চা কই ?

—আছে সব আমার কাছে। একটু গরম জল পেলেই তৈরী করে নেব আমি। সকালে চা-খাওয়া বড় বদ অভ্যাস আমার। চা না খেলে, কোন কিছুই করতে ভাল লাগে না।

—আপনি কইছেন, ভাল করিছেন। কাল থিক্যা ঠিক সকালে উঠ্যাই চা পাবেন। আমাকে চা ছ্যান আমি কবে দিই।

—তুমি চা করতে পার, আমি জানতাম না।

—বাবু-পাড়ায় সগ্‌গলেই চা খায়। আমি দেখিছি কি কর্যা তৈরী করে।

ঘরের ভেতর থেকে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম এনে প্রসাদীকে দিল অনিরুদ্ধ। চায়ের নেশা অনিরুদ্ধ ছাড়তে পারেনি—তাই সব সরঞ্জাম তার সঙ্গেই থাকে।

প্রসাদীকে জিনিষগুলো দিয়ে অনিরুদ্ধ বলল,—জল একটু বেশী করেই কর—সবাই খাবে।

মুস্কিলে পড়ল প্রসাদী।

চা করতে সে দেখেছে, কিন্তু করেনি কখনও। কতটুকু জলে কতখানি চা-চিনি দুধ দিতে হয়, ভেবে পায় না সে।

এক গামলা জল চাপিয়েছে। উনুনের ওপর জল ফুটছে। এখন কি করবে, সে বুঝে উঠতে পারছে না।

নিজে সেধে বলেছে, চা করতে সে জানে। যদি চা খারাপ হয়, কি ভাববে বাবুরা! হয়ত মুখে কেউ কিছু বলবে না, মনে মনে পাড়া-গাঁয়ের মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় হাসবে। ছিঃ ছিঃ, অনিরুদ্ধের একটু প্রশংসা পেয়ে তার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, সেধে চা করতে সে গেল! নিজের ওপরেই রাগ হতে লাগল প্রসাদীর।

মণ্ডল যে বলেছে, প্রসাদীর মাথা পরিষ্কার তা মিথ্যে নয়। অনিরুদ্ধ প্রসাদীকে একটা পেয়ালা দিয়েছিল। প্রসাদী সেই পেয়ালায় মেপে মেপে প্রতি কাঁসার গ্লাসে জল ঢালল। তারপর সেই জল একটা বড় বাটিতে ঢেলে আন্দাজ মত চা-চিনি-দুধ সব এক সঙ্গে দিয়ে নাড়তে লাগল। যেই চায়ের রং গাঢ় হয়ে এল আবার কাঁসার গ্লাসগুলোতে ঢেলে ফেলল। কাপড় দিকে ছেঁকে নিল।

চা-চিনি-দুধ কোনটাই ঠিক মত হয় নি। কিন্তু খুব বেশী তারতম্যও হয় নি।

চা খেয়ে অনিরুদ্ধ বলল,—বেশ হয়েছে।

বেশ না হলেও অনিরুদ্ধের দেখাদেখি সবাই বলল,—সত্যিই, বেশ ভাল চা হয়েছে।

ঘরের ভেতর থেকে প্রসাদী শুনল। এই রকমই যে তারা বলবে, তা সে জানত।

ঘরে থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে প্রসাদী বলল,—না, ভাল হয় নি। চা আমি করতে দেখিছি, করি নাই কোন দিন। আপনারা দেখ্যায়ে দেবেন, পরে ভাল কর্য়া চা কর্য়া দেব।

—না করলেও, চা তোমার আজ খারাপ হয় নি। বিকেলে আবার চা করে দিও।

অনিরুদ্ধ বলল।

—দেখ্যায়ে দেবেন।

—দেব।

চায়ের কাপটা রেখে অনিরুদ্ধ উঠে পড়ল।

—চল, মণ্ডল এবার যাওয়া যাক।

—চলেন।

উঠে পড়ল সবাই।

চার

তিন ডাকেও প্রসাদীর সাড়া পেল না কেদারের মা।

রান্নাঘরে জ্বলন্ত উনুনের ধারে বসে আছে প্রসাদী। কেদারের মায়ের ডাক তার কানে যায় নি।

কেদারের মা এবার বেশ একটু জোরেই বলে উঠল,—ওলো রাই, সক্কাল বেলাতেই কি কালাচাঁদের ধ্যানে বসলি?

এতক্ষণে প্রসাদী শুনতে পেল তার কথা।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল,—আমার কি ভাগ্যি, সকাল বেলায় দিদির মুখ খ্যাখলাম। দিন আমার আজ ভালই যাবিনি।

—এ পোড়া মুখ দেখ্যা দিন কারো ভাল যায় না লো। তোর দিন এমনিতেই ভাল যাবিনি।

—বস দিদি।

—বসবার জো নাই। কেদারের ভাতে কয়খ্যান মৌলবী কচুর পাতা দেব, তাই আল্যাম। মৌলবী কচুর পাতা বড় ভালবাসে কেদার।

—আমিও বাসি। তা নিয়্যা যাও না ক্যান, যে কয়খ্যান লাগে।

—তা তো নেবই। কিন্তুক তোর এত ভাব লাগিছে কিসের? তিন ডাকেও সাড়া দিসন্যা ক্যান?

—আমার আবার ভাব লাগালাগি কি? সে সবের জন্যে আমি না, অন্য লোক। কাল জল-ঝড়ে বাবুর‍্যা আ্যাল। তা রাত কর‍্যা কি ব্যান দিই। শুধ্যা ভাতে-ভাত ধর‍্যা দিলাম। আজ কত্তাদাকে বাজার থিক্যান মাছ আনবার কইছি। ভাবতিছিল্যাম আর কি ব্যান্নন করব।

—ওহো, আমিও তাই কই! আথারি-পাথারি শুধ্যা বাইরি না, তোর পরাণডার মধ্যিও।

—সব তাতিই তোমার রঙ্গ।

—তোর মনে রঙ লাগিছে, তাই কই।

—জান, বাবু আমারে বুন বল্যা ডাকিছে।

প্রসাদীর কথা শুনে কেদারের মা গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল,—কোন বাবুডারে রাই ?

—ধলা-পানা চশমা-চোখি।

—বাবু বড় চালাক মনে কয়। কিন্তুক বেড়া লাগালিই কি ফুলের বাস আটক্যান যায়? কাছে শুধ্যা যাওয়া যায় না, পরাণডা পাগল করে। আচ্ছা, আমি যাই রে। কেদার একা আছে।

—যা লাগে, পাতা নিয়্যা যাও।

প্রসাদীকে 'রাই' বলে ডাকে কেদারের মা। কল্পিত কাঁলাচাঁদের নাম করে দু'একটা রসিকতাও করে।

'রাই' বলে ডাকার পেছনে ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে।

গ্রামে একজনের বাড়িতে একবার কৃষ্ণযাত্রা হয়েছিল। প্রসাদীও শুনতে গিয়েছিল, সকলের সঙ্গে। যাত্রাদলের শ্রীরাধিকা-বেশী বালক, অভিনয়ে শ্রীরাধিকার বিরহ-জ্বালা ব্যক্ত করে সবাইকে কাঁদিয়েছিল। প্রসাদীও কেঁদেছিল। তার অন্তর মথিত হয়ে কান্না বেরিয়েছিল। সে এত বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, কয়েকদিন পর্যন্ত অন্য-কোন কিছুতে সে মন দিতে পারে নি।

শ্রীরাধিকা গেয়েছিল--

"সই ! না কহ ওসব কথা।
কালার পীরিতি যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা।
কালিন্দীর জল নয়নে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগায়ে
কালা হৈল জপমালা।"

প্রসাদীও গুন গুন করে গানটি গাইত।

প্রসাদীর হাব-ভাব দেখে, কেদারের মা তাকে ঠাট্টা করে 'রাই' বলে ডেকেছিল। সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল প্রসাদী কৌতুকচ্ছলে! ক্রমে সেই ডাকটাই তুজনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গেল।

প্রসাদী আর কেদারের মায়ের মধ্যে বয়সের প্রভেদ অনেকখানি। তবুও তুজনের মধ্যে সহজ সখীত্বের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

বাপ-মা মরা স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েটিকে কেদারের মা স্নেহ করে, ভালবাসে। আর প্রসাদীও শ্রদ্ধা করে কেদারের মাকে।

ছ'মাসের ছেলে কেদারকে নিয়ে বিধবা হয়েছিল সে। অতি হীন অবস্থা।

দিন মজুরী করত তার স্বামী। কোন সঞ্চয় রেখে যেতে পারে নি। তার সৎকার করবার পয়সাটীও না।

মোড়ল ঈশান মণ্ডল সৎকারের সমস্ত খরচ বহন করেছিল।

নিঃসহায় অভিভাবকহীনা ছোটলোকের ঘরের মেয়ের সহজ ও সচ্ছল পথকে উপেক্ষা করবার নজির এ গাঁয়ে নেই। কেদারের মাও সেই সহজ পথে চললে, আশ্চর্য হ'ত না কেউ। বরং আশ্চর্য হ'ল তার ভিন্ন পথে চলায়

এ সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, মৃত স্বামীর জন্যে সদ্য-বিধবা যুবতী খুব শোক-উচ্ছ্বাস করে প্রথম প্রথম। তারপর ক্রমে উচ্ছ্বাসে পড়ে ভাটা। আরও দিন গেলে, তার চলন-বলনে শোকের কোন চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাহারে শাড়ী পড়ে। পান খেয়ে ঠোঁট তুটো লাল-টুকটুকে করে ঘুরে বেড়ায়। গৃহস্থ বাড়ি ঘুরে ঘুরে লাউ-কুমড়ো, কলা-মূলো বিক্রী করে কেউ কেউ, আবার অনেকে ভদ্র-লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নেয়। বাইরে একটা আবরণ তো চাই! তবে চাপা থাকে না কিছুই। চাপা রাখবার গরজও বিশেষ নেই তাদের।

এমনিই চলে আসছে—যেন এইটাই স্বাভাবিক।

কেদারের মায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না। জমিদারের নায়েব ননী লাহিড়ীকে পর্যন্ত আমল দিল না সে।

তার সতীপনায় প্রথম আস্থা রাখে নি কেউ। সবাই ভেবেছে, শুধু দুদিনের অপেক্ষা।

দুদিন কেন, দশ বছরেও ব্যতিক্রম হল না কিছু। পরের বাড়ি ঢেঁকিতে পা, আর কাঠখোলায় হাত পুড়িয়ে দিন গুজরান করতে লাগল কেদারের মা। অমানুষিক খাটতে পারে সে। যেমন আঁট-সাট গড়ন, কাজ করবার তেমনি অফুরন্ত তার শক্তি। এক দিনে তিন-কুড়ি চিঁড়ে পাড় দিয়ে দেয় সে। সবাই তাকে ডাকে, কাজ করিয়ে নেয়। তার কাজে গৃহস্থ খুসী।

অতিবড় শত্রুও কেদারের মায়ের নামে কোন অপবাদ দিতে পারে নি। বরঞ্চ তাকে সম্ভ্রম করে সবাই।

মোড়ল ঈশান মণ্ডলের বাড়ির পাশেই কেদারের মায়ের কুঁড়ে। বিপদে আপদে সে মোড়লের কাছেই এসে দাঁড়ায়।

প্রথম প্রথম যে সব উৎপাত তাকে সহ্য করতে হত—এখন আর সে সব নেই। এখন সে নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন।

কেদারের মা চলে গেল, কিন্তু তার কথাগুলো গেল না প্রসাদীর মন থেকে।

ধরা পরে গেছে সে নিজের কাছেই। কেদারের মা অস্পষ্টতাকে শুধু স্পষ্ট করে দিয়ে গেল।

অনিরুদ্ধকে তার ভাল লেগেছে, প্রথম যেদিন সে তাদের বাড়ি এসেছিল সেদিন থেকেই।

কেদারের মাকে সে বলেছিল, বাবুদের কথা। বাবুরা কত্তাদাকে যে কথা বলেছিল, সেই কথা। বুঝতে পারে নি সে সব কথা, তবুও তার ভাল লেগেছিল কথাগুলো। বাবুরা বলেছে, নায়েবের হাতে মার খাবার দিন আর নেই। বাধা দিতে হবে নায়েবকে, সাহস করে,

এগিয়ে যেতে হবে। জমিতে চাষ করে যে, ফসল ফলায় রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে—জমির ওপর তার দাবী সকলের চাইতে বেশী।

ভাল লেগেছে। খুব ভাল লেগেছে প্রসাদীর বাবুদের কথাগুলো। কথাগুলো যে বলেছে, তাকেও যে প্রসাদীর ভাল লেগেছে—সে কথা বুঝতে কেদারের মায়ের দেরি হয় নি।

অনিরুদ্ধকে ভাল লেগেছে, এ নিয়ে প্রসাদীর মনে কোন অস্বস্তি ছিল না। কিন্তু কেদারের মা চলে যাবার পর, নিজের মনের অলি-গলিতে যতই সে হাতড়িয়ে বেড়াতে লাগল—ভাল-লাগার গভীরতা ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠল। রান্নাঘরে উনুনের ধারে বসে প্রসাদীর মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল—আগুনের আঁচে নয়, লজ্জায়॥

পাঁচ

বাবুপাড়ার প্রথমেই পড়ে ললিত মজুমদার মশায়ের বাড়ি।

মজুমদার মশায় কাগজ পড়ছিলেন।

অনিরুদ্ধদের নিয়ে মণ্ডল সেখানে যেতেই মজুমদার মশায় বললেন,—এস, এস মণ্ডল। এঁনারা?

—কলকাতা থিক্যা আইছেন বাবুরা। এখানকার বানে ভাস্যার খবর শুন্যা আইছেন। আপনিগরে সাথে আলাপ করব্যার আল্যান।

—বেশ, বেশ, বসুন আপনারা।

সবাই আসন গ্রহণ করলে, মজুমদার মশায় বললেন,—আপনাদের আসার কথা আমি শুনেছি। নিজে যেতে পারি নি। বাতে পঙ্গু আমি। বাড়ি থেকে বেরুতে পারি না।

কথা বলতে বলতে নিজের ছোট মেয়েকে ডাকলেন তিনি।

মেয়েকে বললেন,—যাও তো মা, বউমাকে বল, এঁদের জন্যে জলখাবার পাঠিয়ে দিতে।

অনিরুদ্ধ বাধা দিয়ে বলে উঠল,—আমরা এইমাত্র খেয়ে বেরিয়েছি।

—তাতে কি হয়েছে। বিশেষ কিছু নয়, সামান্য জলখাবার, ওতে কোন অসুবিধা হবে না আপনাদের। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, নূতন লোক কেউ বাড়িতে এলে, শুধু মুখে যেতে দিতে পারি নে।

অনিরুদ্ধ কিছু উত্তর দেবার আগেই মোড়ল বলল,—তা তো নিচ্চয়ই। আর, ওঁনারা খাইছেন তো শুধ্যা এক গেলাস কর‍্যা চা। ভাতি ওঁনাদের পেট ভরতি পারে—আমাদের কিছুই হয় না। বউমার হাতের খাবার আমি না খায়্যা উঠব না।

মণ্ডলের কথায় সবাই হেসে উঠল।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মজুমদার মশায় বললেন,—বর্ষাটা এবার একটু বেশীই হয়েছে এদিকে। তা আপনারা খবর পেলেন কি করে?

অক্ষয় পোদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের এখানে আসার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করল অনিরুদ্ধ।

তারপর বলল,—জল যে রকম বাড়ছে, তাতে গৃহস্থপাড়ায় অনেকের ঘরেই যে জল ঢুকবে, সন্দেহ নেই। আপনারা এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কি?

—একেবারে যে ভাবি নি কিছু তা নয়, তবে ননীর কাছে আপনাদের একবার যাওয়া দরকার।

মণ্ডল বলল,—তেনার কাছে যায়্যা কি লাভ? আমাগরে বিপদে তার দায় কি?

—দায় সবার, আর তার সব চাইতে বেশী। লোক অবশ্য সে খুব যে ভাল, তা বলছি না, তবে জমিদারের প্রতিভূ সে—সেটা একবার ভেবে দেখ মণ্ডল। ননীকে আমি ডেকেছিলাম। বলেছি তাকে, জমিদারের আট-চালা আর নাটমণ্ডপ ছেড়ে দেবার কথা। সে রাজী হয়েছে। তার কাছে তোমাদের একবার যাওয়া উচিত, তাই বলছিলাম।

অনিরুদ্ধ বলল,—নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আমরা যাব। আরও

একটা আর্জি আছে তাঁর কাছে,—খাজনা এরা এখন দিতে পারবে না।

হাসলেন মজুমদার মশায়। বললেন,—বেশ তো, তাকে গিয়ে সে কথাও বলবেন।

—আর একটা কথা।

—বলুন।

—শুধু আশ্রয় দিলেই তো চলবে না, আহার্যেরও প্রয়োজন হবে। আপনাদের সবাইকে দুর্গতদের সাহায্য তহবিলে যথাসাধ্য দান করতে হবে।

—নিশ্চয়ই, সকলেরই কিছু কিছু দেওয়া উচিত।

—আপনিই 'রিলিফ-কমিটির' সভাপতি হন। আপনার কাছে সব জমা থাকবে।

—এ বিষয়ে আমি এখনই কথা দিতে পারছি না। গাঁয়ের সবারই মতামত প্রয়োজন।

—সেটা হক্ কথা কইছেন মজুমদার মশায়।

বিজ্ঞের মত রায় দিল মণ্ডল।

—সকলের মতামত নিতে গেলে সব কাজ হয়ে ওঠে না। জল যে রকম বেড়ে চলেছে, আমাদের বেশী দেরি না করে কাজে নেমে পড়তে হবে। আমার বিশ্বাস, এক নায়েব মশায় রাজী হলেই আর কারও অমত থাকবে না। আমরা এখনই তার কাছে যাব—আর কৃতকার্যও হব আশা করি। আমাদের অনুরোধ, আপনি আর দ্বিধা করবেন না মজুমদার মশায়।

—বেশ, আপনারা নবীর কাছ থেকে ঘুরে আসুন।

মজুমদার মশায়ের মেয়ে কয়েকখানি রেকাবিতে জলখাবার নিয়ে এল।

নাড়ু, মোয়া, তক্তি—বেশ বেশি পরিমাণে প্রতি রেকাবিতে সাজান।

মণ্ডল তো মহাখুসী। বলল,—নেন আপনিরা। না খায়্যা ছাড়া পাব্যান না। বউমা দরজার আড়ালেই আছেন।

জলখাবার খেয়ে সবাই উঠে পড়ল।

মজুমদার মশায় বললেন,—আপনাদের একটা অনুরোধ করব। যদিও মণ্ডল যখন রয়েছে, আপনাদের যথাসাধ্য সে করছে, তবুও এভাবে নৌকায় বাস করা আপনাদের অভ্যাস নেই। তাই বলছিলাম, আমার এখানে এসে যদি থাকেন—

—আপনি এত করে কেন বলছেন, আপনি যে আমাদের দূরে ঠেলে দেননি, এতেই আপনার যথার্থ পরিচয় পেয়েছি। আমাদের সব রকম অসুবিধায় বাস করা অভ্যাস আছে। আর কাল তো ঝড়-বৃষ্টির সময় মণ্ডলের অতিথি হয়েছিলাম। আমরা দুর্গতদের মধ্যেই বাস করতে চাই। এতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। আপনি আমাদের গুরুজন-তুল্য, 'তুমি' বলেই বলবেন আমাদের।

—বেশ বাবা, বেশ। তোমাদের পরিচয় পেয়ে বড় আনন্দ পেলাম। আচ্ছা মণ্ডল, নায়েবের কাছে এদের নিয়ে যাও।

মজুমদার মশায়কে নমস্কার করে মণ্ডলের সঙ্গে সবাই চলে গেল।

ছয়

নিত্যকার মত ক্ষিতু সরকারের বাড়ি নায়েবের সান্ধ্য আসর জমে উঠেছে।

ক্ষিতু সরকারের শোবার ঘরে, তারই খাটের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে নায়েব ননী লাহিড়ী আলবোলা টানছে।

মেঝেয় মাতুরে বসে মদ্য পান করছে ক্ষিতু সরকার।

অদূরে তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে কল্কে সাজছে নায়েবের দক্ষিণ-হস্ত ও সাক্রেদ পরাণ মণ্ডল।

রান্নাঘর থেকে মাংস রন্ধনের সুগন্ধ ভেসে আসছে। ক্ষিতুর স্ত্রী মাংস রান্না করছে।

মাংসের খরচ নায়েবের। ক্ষিতুব নেশার খরচও জোগায় নায়েব। নায়েব ক্ষিতুর বন্ধু।

ক্ষিতু সরকারের অবস্থা আগে ভালই ছিল। ছোটবেলা মা-বাপ মারা যেতে, ক্ষিতুর মামা তাকে কোচবিহারে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। কোচবিহার ষ্টেটে ভাল চাকরি করত তার মামা।

গাঁয়ে থাকতে ননী ছিল ক্ষিতুর প্রিয় বন্ধু। ম্যাট্রিক পাস করে ক্ষিতু যখন একবার দেশে বেড়াতে এল, ননী তখন জমিদারের কাছারীতে ঢুকেছে। ননী তাকে যুক্তি দিল, দেশে গাঁয়ে এসে বাস করতে। গাঁয়ে বাস করবার পক্ষে তু' একটি লোভনীয় খবরও ক্ষিতুর সামনে তুলে ধরল ননী।

বন্ধুর কথা ঠেলতে পারল না ক্ষিতু। সেবার বেশ কিছুদিন সে গাঁয়ে থেকে গেল।

বিন্দে বাগ্‌দির মেয়ে বাজুকে নিয়ে ক্ষিতুর মাতামাতির খবরটা ক্রমে তার মামার কানে গিয়েও পৌছল। জোর তলব করে মামা তাকে কোচবিহারে ডেকে পাঠাল।

ক্ষিতুর মন-মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। মামা হাজার চেষ্টা করেও

ক্ষিতুকে পড়াশোনায় মন দেওয়াতে পারল না। কলেজে ভর্তি হ'ল ক্ষিতু ঠিকই—কিন্তু পড়া-শোনার চাইতে অপকর্মে তার নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

মামীর পরামর্শে মামা তাকে কলেজ ছাড়িয়ে দিয়ে বিয়ে দিল।

তারপর ক্ষিতুর দিন বেশ ভালই কাটতে লাগল। খায়-দায় আর বন্ধু-মহলে আড্ডা দেয়। নববধূর প্রেম-সৌরভে মন তার মসগুল—একেবারে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ক্ষিতুর চিত্তে। দুনিয়াটা স্বর্গ মনে হতে লাগল ক্ষিতুর।

কিন্তু এই স্বর্গরাজ্য থেকে কে যেন ক্ষিতুকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে কাঁটা বনে ফেলে দিল। ক্ষিতুর মামা মারা গেল।

মামীমা আর মামাতো ভাই বোনদের সঙ্গে ক্ষিতুর মনোমালিন্য হতে লাগল। মাঝে মাঝেই ঝগড়া হত। শেষে একদিন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে ক্ষিতু স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরল।

আবার দু'বন্ধুতে মিলন ঘটল।

ননী লাহিড়ীর তখন জমিদার কাছারীতে পাকা বন্দোবস্ত—তবে নায়েবীটা তখনও হাতে আসেনি।

ক্ষিতু নিজের বিষয়-আশয় হাতে পেয়ে খুব দিল-দরিয়া চালে চলতে লাগল।

বন্ধুর সংস্পর্শে ক্ষিতু নেশা ও অপকর্মে যতই পক্ক হয়ে উঠতে লাগল, পৈতৃক সম্পত্তির ভিত সেই পরিমাণে আলগা হয়ে যেতে লাগল। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ভদ্রাসনটুকু ছাড়া ক্ষিতুর বিষয়-আশয়ের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।

ইতিমধ্যে ননী লাহিড়ী নায়েবী পদে কায়েমী হয়ে বসেছে। ক্ষিতুর আর্থিক অবস্থা যতই হীন হোক না কেন, বন্ধুর কৃপায় নেশা আর আনুষঙ্গিক খরচ ঠিকই জুটতে লাগল। ক্ষিতু বেপরোয়া হয়ে ডুবে যেতে লাগল।

আজকাল ক্ষিতুর ঘরে ননী লাহিড়ীর নিত্য আসর বসে।

ক্ষিতুর স্ত্রী সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলে। ক্ষিতু সব দেখে শুনেও নির্বিকার। ক্ষিতুর সংসার-খরচের ভারও ননী লাহিড়ীর। স্ত্রীর কাপড় চোপড়ের ভাবনাও ক্ষিতুকে ভাবতে হয় না। ক্ষিতু নিশ্চিন্ত মনে ননী লাহিড়ার পয়সায় মদ্যপান করে চলে।

মামা-মামীর আদরে ক্ষিতুর মেরু-দণ্ড এমনিতেই দুর্বল ছিল, তারপর নেশার বশ হয়ে, তার ভেতরে পদার্থ বলে আর কিছুই নেই।

তামাক সাজতে সাজতে পরাণ বলল,—ইডা কিন্তুক ঠিক হল না নায়েব মশায়।

আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধ-নিমীলিত চোখে আলবোলায় সুখ টান দিচ্ছিল নায়েব মশায়। ইতিপূর্বে এক আধ গ্লাস টেনেছিল সে। নেশাটাও একটু জমে উঠেছে তার।

টেনে টেনে বলল—কিসের কথা বলছিস রে পরাণ?

—না, এই কই ঐ কলকাতার বাবুগরে কথা। তারা যা ক'ল, আপনিও তাই 'হ্যাঁ' করলেন—তাই কতিছি। ইডা কি ঠিক হল?

পরাণ মণ্ডলের কথা শুনে নায়েবের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

পরাণের কথার উত্তর না দিয়ে নায়েব বলল,—হ্যাঁরে পরাণ, তোর বউকে ঘরে আনবি?

বিস্মিত হয়ে নায়েবের দিকে তাকিয়ে পরাণ বলল,—কি কন আপনি?

তোর বউ পেসাদীকে যদি ঘরে আনতে চাস তো, বল্, তাকে তোর কাছে এনে দিই।

—পাঠাবিন্যা তাক বুড়্যা মণ্ডল।

—তোর বিয়ে করা বউকে ঈশান মণ্ডল কোন আইনে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। আমি পেসাদীকে তোর কাছে এনে দেব।

একটু চুপ করে থেকে পরাণ বলল,—না থাক্, বউ নিয়্যা ঘর করা

আমার বরাতে নাই। আর—ইয়ে, না থাক নায়েব মশায়, ওসব হাঙ্গামায় কি দরকার? ও যদি ইচ্ছে কর‍্যা আসে কোন দিন, তয় আসবি।

—জোয়ান মেয়েছেলেকে জোর করে দখলে রাখতে হয় রে, বোকা।

ক্ষিতুর স্ত্রী এক বাটি মাংস নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল,—কার কথা কও মিত্যান?

—পরাণের বউ পেসাদীর কথা। পরাণ যদি চায়, তাকে আমি এনে দিতে পারি ওর কাছে।

—পরাণ কি কয়?

—যেমন বোকা, বলে, আসে তো ইচ্ছে করেই আসবি।

—কলকাতার বাবুদের ছেড়ে কি আর তোর দিকে নজর দিবে সে? কলকাতার বাবুরা তো পেসাদির আঁচলের তলায় যায়ে উঠিছে শুনলাম।

ক্ষিতুর স্ত্রীর কথায় পরাণের মুখ লাল হয়ে উঠল।

বলল,—সব মিয়্যাছেলের নজর কি আর আপনির মত খোলসা হয় মিত্যান? আসব্যারও তো পারে?

ক্ষিতুর স্ত্রীকে পরাণও 'মিত্যান' বলে। ক্ষিতু ও নায়েবের এক গেলাসের ইয়ার সে। হয়ত কোনদিন নেশার ঝোঁকে ক্ষিতুর স্ত্রীকে 'মিত্যান' বলে সম্বোধন করে ফেলেছিল পরাণ। অপর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ না আসায়, ঐরূপ সম্বোধন করতেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পরাণের কথার খোঁচাটা ক্ষিতুর স্ত্রী ঠিকই বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি বলল,—দেখতো মিত্যান, মাংসটা কেমন হল?

নায়েবের মুখের কাছে বাটিটা এগিয়ে ধরল ক্ষিতুর স্ত্রী।

—দাও, একটুকরো মুখে ফেলে দাও।

হাঁ করল ননী লাহিড়ী।

একটুকরো মাংস তুলে নায়েবের মুখে ফেলে দিল ক্ষিতুর স্ত্রী।

চিবোতে চিবোতে নায়েব বলল,—বেড়ে হয়েছে রে পরাণ। তুইও একটু চেখে দেখ।

ক্ষিতুর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পরাণ বলল,—ছোটবাবুরে ছ্যান মিত্যান।

ক্ষিতুর দিকে এবার নায়েবের নজর গেল।

বলল,—হ্যাঁ দাও, ক্ষিতুকে দাও। ক্ষিতু খা, তোর বউ বেড়ে রেঁধেছে আজ।

ঠাস করে মাংসের বাটিটা ক্ষিতুর মাতুরের ওপর রেখে দিয়ে ক্ষিতুর স্ত্রী চলে গেল।

সকলকে খাইয়ে নিজে খেয়ে এ ঘরে এসে ক্ষিতুর স্ত্রী দেখল, নায়েব পান চিবোচ্ছে, আর চোখ বুঁজে আলবোলা টানছে। পরাণ বা ক্ষিতু কেউ ঘরে নেই। তারা হয়ত বাইরের ঘরে গিয়ে মদ্যপান করছে।

—কি গো মিত্যান. ঘুমুলে নাকি ?

—না ঘুমুয়নি বুলুরাণী, এস বস।

—দাঁড়াও মুখে একটা পান দিই।

গভীর রাত্রে নায়েব মশায় বাইরের ঘর থেকে পরাণকে ডেকে নিয়ে বাড়ি গেল।

ক্ষিতু তখন বাইরের ঘরে অনাবৃত তক্তাপোষের ওপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বুলুরাণী তার ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছে।

সাত

বদন মণ্ডল পুত্র পরাণের সাথে প্রসাদীর বিয়ে দিয়েছিল। প্রসাদীর বয়স তখন তিন, আর পরাণের বারো।

বদনের অবস্থা তখন ভালই ছিল। বদনের হঠাৎ মৃত্যুর পর তার স্ত্রী-পুত্রের অবস্থা খুব পড়ে গেল। নাবালক পরাণকে ফাঁকি দিল অনেকে। তার মা জমি-জমা বিক্রয় করে ছেলেকে মানুষ করতে লাগল।

পরাণ যখন যৌবনে পা দিল, প্রসাদীকে নিতে পাঠিয়েছিল পরাণের মা। কিন্তু ঈশান মণ্ডল প্রসাদীকে পাঠায়নি। ওজর দেখিয়েছিল, মেয়ে এখন ছোট।

পরাণের মা কিন্তু ঠিকই বুঝেছিল যে, তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে বলে মোড়ল পাঠাতে চায় না প্রসাদীকে।

আরও কিছুদিন পর, পরাণ জোর করেই বউকে আনতে গেল। পাঠাল না মোড়ল। উপরন্তু বলল, বউকে ভাত-কাপড় দিব্যার ক্ষ্যামতা কর্‌্যা বউ নিয়্যা যাস।

এই নিয়ে ঈশান মণ্ডলের সঙ্গে পরাণের খুব ঝগড়া হয়ে গেল। রাগ করে চলে গেল পরাণ।

আরও দিন গেল।

প্রসাদীর সর্ব-অঙ্গে তখন যৌবনের ইঙ্গিত।

একদিন মজুমদারের ঘাট থেকে জল নিয়ে আসছিল প্রসাদী। পরাণ দেখল তাকে। তার বুকের ভেতরটা গুমড়িয়ে উঠল। সঙ্গে আরও অনেক বউ-ঝি ছিল, তাই ইচ্ছা থাকলেও সাহস করে প্রসাদীর সঙ্গে কথা বলতে পারল না পরাণ।

প্রসাদীকে ঘরে আনতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল পরাণ। কিন্তু ঈশান বেঁচে থাকতে, তা হবার নয়। পরাণ যে ব্যবসা করে কিছু উপার্জন করবে—সে মূলধনও তার নেই। হাল-লাঙ্গল সব গেছে,

পুনরায় করবার ক্ষমতা নেই। পরের বাড়ীতে চাকর খাটতে পারবে না সে। আর চাকর খাটলে ঈশান মণ্ডল বোধ হয় আরও বেঁকে বসবে। মোড়লের একটা সম্মান তো আছে! তবে কি করবে সে? উত্তপ্ত মস্তিষ্কে, চুরি করবে ব'লে সে ঠিক করল। প্রসাদীকে ঘরে আনতেই হবে যে।

হায়, বিধাতা তাতেও বাধ সাধলেন।

স্বাস্থ্যবান, উন্নত-নাসা যুবক পরাণ মণ্ডল। নেহাত অভাবের তাড়নায় চুরি করতে সে বাধ্য হয়েছিল। জীবনে একবারই সে চুরি করেছিল—আর ধরাও পড়েছিল হাতে-নাতে। আনাড়ি চোর সে। নিষ্ঠুর ভাগ্যকে সেদিন সে ধিক্কার দিয়েছিল।

তিন মাসের জেল হল পরাণের।

জেল থেকে ফিরে সে দেখল,—তার আপন বলে আর কেউ নেই। লজ্জায়-অপমানে তার মা আত্মহত্যা করেছে।

পরাণ সব অভিমান ত্যাগ করে ঈশান মণ্ডলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আশা ছিল, মোড়ল এ দুর্দিনে তাকে দূরে সরিয়ে দেবে না। কিন্তু মোড়ল বড় একরোখা। পরাণকে অপমান করল সে।

বলল,—ডাকাতি কি খুন কর্যা আমার কাছে আস্যা দাঁড়ালি, আমার মাথা হেঁট হত না, কিন্তুক সিঁদেল চোরের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রসাদী বিধব্যা হইছে।

পরাণের ইচ্ছে হয়েছিল, একবার বৃদ্ধ ঈশান মণ্ডলের টুঁটিটা চেপে ধরে।

কিন্তু কিছুই সে করল না। আস্তে আস্তে মোড়লের উঁচু পালান থেকে নেমে এল।

পরাণ যখন কারও কাছ থেকেই কোন সহানুভূতি পেল না, নিজের সমাজে পেল না ঠাঁই—নায়েব ননী লাহিড়ী তাকে ডেকে পাঠাল।

সেই থেকে পরাণ জমিদারের পেয়াদা, আর নায়েব মশায়ের সর্ব-অপকর্মে দক্ষিণহস্ত।

পরাণকে যেদিন কত্তাদা অপমান করে তাড়িয়ে দেয়—প্রসাদী কত্তাদার সমস্ত উক্তিই দাঁড়িয়ে শুনেছিল। পরাণ সম্বন্ধে তার মনে তখন কোন দাগই কাটে নি। লোকের মুখে শুনেছিল, ছোটবেলা পরাণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। পরাণ আর প্রসাদী কোনদিনই একসঙ্গে মেশবার সুযোগ পায় নি। পরাণ সম্বন্ধে তাই প্রসাদীর মনে কোন কৌতূহলও ছিল না।

সে ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে।

প্রসাদী যখন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, পরাণ ততদিনে নায়েব মশায়ের সুযোগ্য সহচর বলে খ্যাতিলাভ করেছে। ঈশান মণ্ডল তো পরাণের নাম উচ্চারণ করতেও ঘৃণা বোধ করে। প্রসাদী নিঃশব্দে নিজের মন থেকে পরাণের চিন্তা মুছে ফেলল। পরাণের সঙ্গে যে তার বিয়ে হয়েছিল, সে কথাই সে বোধহয় ভুলে গেল। অবশ্য সে কথা তাকে মনে পড়িয়েও দিত না কেউ।

আট

জল রোজই বাড়ছে।

ইতিমধ্যে ডাঙ্গিপাড়ার পাঁচ ঘর হিন্দু গৃহস্থ জমিদারের নাট-মণ্ডপে আশ্রয় নিয়েছে।

মুসলমানদের জন্যে আটচালায় থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু এখনও কেউ সেখানে আশ্রয় নেয় নি।

অনিরুদ্ধেরা রোজই ভিক্ষায় বেড়ায়। গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী ছেলেও তাদের সঙ্গে জুটেছে। আর জুটেছে রবি ডাক্তার—মজুমদার মশায়ের ছেলে। বন্যার্ত-রুগীদের সে বিনা-ভিজিটের

ডাক্তার, তবে রুগীদের সম্বন্ধে অবহেলা তার নেই! ডাক্তার হিসেবে যতবড় সে না হক, লোক হিসেবে সে অনেক বড়। গ্রামের লোকের মুখে মুখে তার নাম।

সারাদিন ঘুরে বিকেলে অনিরুদ্ধ বন্ধুদের সঙ্গে ফিরে এল তাদের আস্তানায়।

আস্তানা অর্থে, পীতাম্বরের ডিঙ্গি। ডিঙ্গিতে থাকে অনিল। অনিলের ওপর রান্নার ভার।

মণ্ডলের পালানের নীচেই আজকাল ডিঙ্গি বাঁধা থাকে।

অনিরুদ্ধেরা মণ্ডলের ডিঙ্গি নিয়ে যাতায়াত করে।

ডিঙ্গিতে পা দিয়েই অনিরুদ্ধ বলল,—ভাত দে, অনিল।

—ভাত নেই।

—নেই মানে?

—রাঁধি নি।

—চাল নেই, তা আগে বলতে পার না? যত সব অপদার্থ—

রাগের চোটে কথা শেষ করতে পারল না বিভাস।

সারাদিন পরে খেতে এসে, রান্না হয় নি শুনে, রাগ হয়েছিল সবারই। বিভাস রাগটা আর চাপতে পারল না।

বিভাসের রাগে, অনিলের কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না।

সহজভাবেই সে উত্তর দিল,—চাল আছে। রাঁধতে দেয় নি, তাই রাঁধি নি।

অনিরুদ্ধ বলল,—কি যা-তা বলছিস? কে রাঁধতে দেয় নি?

—আমি দিই নি।

পেছন ফিরে অনিরুদ্ধ দেখল, ডিঙ্গির কাছে প্রসাদী এসে দাঁড়িয়েছে।

—কত্তাদা আপনিগরে জন্যি বস্যা আছে। আপনিরা চলেন।

—তোমাদের বাড়ী আমাদের আজ নিমন্ত্রণ নাকি? গাধা অনিলটা এতক্ষণ সে কথা না বলে, মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে।

বিভাসের কথায় প্রসাদী মৃদু হেসে বলল,—নিমন্তণ্য আবার কি? এখন চলেন সব, বেলা যে আর নাই।

—আচ্ছা, তুমি যাও। আমরা আসছি এখখুনি।

সকলের হয়ে জবাবটা দিল বিভাস।

নিমন্ত্রণের কথায় বিভাসের সব রাগ জল হয়ে গেছে। বরঞ্চ সে খুসীই হয়েছে।

মণ্ডল ব্যক্ত করল,—আজ সে একটা বড় রুই মাছ মেরেছে পলো দিয়ে। তাই মাছটা বাবুগরে সেবায় লাগাতে সে মনস্থ করেছে।

বিভাস বলল,—তা বেশ মণ্ডল, ভালই করেছ। খিদেটাও লেগেছে মন্দ নয়। অনিলের হাতের পোড়া-ডাল আজ আর খেতে হল না।

প্রসাদী বলল,—পোড়া-ডাল কে আপনিগরে খাতি কয়? আপনিগরে দয়া হলি, আমরা রোজ দুটো পেসাদ পাতি পারি।

প্রসাদীর কথার বাঁধুনি আছে।

অনিরুদ্ধ বলল,—না, তা হয় না প্রসাদী। তুমি আর মণ্ডল আমাদের যথার্থ বন্ধু। তোমরা অনেক করছ আমাদের জন্যে। রোজ খাওয়ানোর ভার নিতে যাবে কেন?

—ভার আবার কিসির? আচ্ছা, তাই যদি মনে করেন, তয়, চাল দিবেন, রাঁধ্যা দিব আমি।

—বেশ, তাই হবে।

—ঠিক তো?

—প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছ?

উত্তর দিল না প্রসাদী।

—তুমি যা বলেছ, তাই হবে।

অনিরুদ্ধ পুনরায় বলল।

—দিদির কথা কেউ ফেলতি পারে না।

হাসতে হাসতে বলল মণ্ডল।

সবার সঙ্গে মণ্ডল খেতে বসল না দেখে, অনিরুদ্ধ বলল,—কই মণ্ডল, তুমিও বস।

—না বাবু, আমি পরে বসবো নে।

—না, তা হবে না। আমাদের সঙ্গেই তোমায় বসতে হবে। তা না হলে, আমরা খাব না।

—আচ্ছা, দেরে দিদি, এক কোণে আমাক একখান পাত দে।

একটু দূরত্ব রেখে মণ্ডল একধারে ব'সে পড়ল।

খেতে খেতে মণ্ডল বলল,—মনে হয়, ইডা জোদ্দারের পুকুরের রুই। তার পুকুর তো ভাস্যা গিছে। মাছগুল্যানও সব বারায়ে গিছে।

প্রসাদী আবার পাতে পাতে মাছ দিয়ে গেল।

অনিরুদ্ধের পাতের কাছে আসতেই, সে বলে উঠল—আহা-হা, কর কি প্রসাদী? এত মাছ খাবে কে?

—আপনি খাবেন।

—তবেই দেখছি, তোমার হাতে খাওয়া আমার কপালে নেই।

বিভাস বলল,—অনির আবার বেশী মাছ খেলে অসুখ করে। ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো—আমি তো আছি, ওগুলো এদিকে নিয়ে এস প্রসাদী।

বিভাসের কথায় সবাই হেসে উঠল।

লজ্জিত হয়ে প্রসাদী বলল,—তাতে কি, চায়্যা খালিই তো ভাল লাগে।

।[illegible] পাতে অনেক বেশী মাছ-তরকারী ঢেলে দিল প্রসাদী।

চিন্তিতভাবে অনিরুদ্ধ বলল,—জল যে রকম বাড়ছে, তাতে নাট-মণ্ডপ আর আট-চালায় কুলোবে বলে তো মনে হয় না, মণ্ডল ?

—সে কথা আমিও ভাবতিছি বাবু। শকুনডা কি কয় ?

—না, তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথা বলবার সুযোগ পাই নি।

একটু হেসে আবার বলল অনিরুদ্ধ,—নায়েব মশায়কে তুমি একবারে দেখতে পার না মণ্ডল ?

—দেখতি পারিন্যা কি সাধে ? যাক্ সে কথা। মজুমদার মশায়রি কব্যান কি করা যায়—জল তো সহজি কমবি বল্যা তো মনে কয় না।

—হ্যাঁ, কালই মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলব।

—জমিদার খাজনা-মাপের কি করল, কিছু শুনিছেন নাকি ?

—নায়েব মশায় তো এখানকার অবস্থা জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন। উত্তর হয়তো কিছু আসেনি এখনও।

খাওয়া শেষে সবাই উঠে পড়ল।

প্রসাদী বলল—কত্তাদা, ডিঙ্গি খিক্যা বাবুগরে বেছনা আন্যা বড় ঘরে পাত্যা দিতি হবি। ডিঙ্গিতে আর থাক্যা কাজ নাই।

প্রসাদীর কথার ওপর আর কেউ কিছু বলল না। জানে, বলেও কোন লাভ হবে না।

রবি ও বুধ দু'দিন হাট বসে সুজানগরে। বেশ বড় হাট। তা ছাড়া বাজার তো রোজই বসে।

সেদিন ছিল হাটবার।

পীতাম্বরের কাছে অনিরুদ্ধ টাকা দিয়েছিল হাট থেকে জিনিষপত্র আনতে।

হাট থেকে ফিরে মণ্ডলের বাড়ীতে এল পীতাম্বর।

—পেসাদিদি, সওদা নাও।

—কত্তাদা বুঝি নিজি হাটে না যায়্যা, তোমার কাছে গছাইছে ?

—না দিদি, মণ্ডলের কথা তো জানিন্যা, ঐ অনিবাবু সওদা আনতি পয়সা দিছিল।

—ও, আচ্ছা রাখ পিতুদা।

এত আনাজ-পাতি, চাল-ডাল দেখে প্রসাদীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

—আর এই নাও, অনিবাবুর চিঠি। রমণী পিয়ন দিল আমাক।

চিঠি আর সওদা দিয়ে পীতাম্বর চ'লে গেল।

অনিরুদ্ধরা কেউ তখন বাড়ী ছিল না। মণ্ডলও গিয়েছিল তাদের সঙ্গে।

মণ্ডল অবশ্য জানত না, অনিরুদ্ধ কখন পীতাম্বরকে হাট করতে টাকা দিয়েছিল।

মণ্ডলকে নিয়ে অনিরুদ্ধেরা যখন মজুমদার মশায়ের বাড়ী যাচ্ছিল, মণ্ডল বলেছিল—আজ হাট করতি হবি। আপনিরাই যান আজ মজুমদার মশায়ের কাছি। আমি হাট ঘুর্‌য়্যা আসি।

অনিরুদ্ধ সে কথায় রাজী হয় নি। বলেছিল,—যা ঘরে আছে, তাই দিয়েই খাব। এ কাজটি আগে। আমাদের জন্যে চিন্তাটা বেশী নয়।

মণ্ডল আর কিছু বলতে পারল না। তাদের সঙ্গে মজুমদার মশায়ের বাড়ীতে তাকেও যেত হল।

নয়

রাত্রে খেতে বসে মণ্ডল বলল,—বাগুন কনে পালি দিদি ?

—পিতুদা আনিছে হাট থিক্যা।

মণ্ডল আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না, প্রসাদীও বলল না কিছু।

অনিরুদ্ধ মুখ বুঁজে খেয়ে চলেছে। সে বিশেষ চিন্তামগ্ন।

অনিল, বিভাসরাও চুপচাপ।

কেমন যেন একটু থমথমে ভাব।

মজুমদার মশায়ের বাড়ীতে নায়েব মশায়ের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল।

জমিদারের কাছ থেকে নায়েব চিঠির উত্তর পেয়েছে। সেই চিঠি নিয়েই মজুমদার মশায়ের বাড়ীতে সে এসেছিল।

জমিদারের চিঠি মোটেই সন্তোষজনক নয়।

নায়েব পড়ে শোনাল সেই চিঠি।

"বন্যার খবর পেলাম তোমার চিঠিতে। খবরের কাগজেও কিছু কিছু লিখেছে।

আট-চালা আর নাট-মণ্ডপে তাদের থাকতে দিয়ে ভালই করেছ। তোমার বিবেচনা মতই কাজ করেছ।

খাজনা-মাপ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য আমার বোধগম্য হ'ল না। যদি জমিদারী থাকে, তবেই আমি জমিদার, আর তারা আমার প্রজা। বাকী খাজনার দায়ে জমিদারী নিলাম হয়ে গেলে, জমিদার আর প্রজার সম্বন্ধ বজায় থাকবে কি? প্রজার বিপদে জমিদার যেমন দেখবে, জমিদারের বিপদেও প্রজা ভরসা। আমার জমিদারীতে তুমি আমার প্রতিভূ—তাদের বিপদে আশ্রয় দিয়ে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিয়েছ; জমিদারকে রক্ষা করবার দায়িত্বও প্রজাদের, এ কথা তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিও।"

এই পর্যন্ত পড়েই নায়েব মশায় চিঠি বন্ধ করল। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—শুনলেন তো সব আপনারা?

কেউ কোন উত্তর দিল না।

সবাইকে নীরব দেখে নায়েব বলল,—জমিদার অন্যায় তো কিছু লেখেন নি। তাঁর উপযুক্ত কথাই লিখেছেন। জমিদারী যাতে

রক্ষা হয়, সে তো প্রজাদেরই দেখা কর্তব্য। খাজনা দেব না বললে কি চলে? আজ না পারে, দু'দিন পরে দিক। আমারও তো একটা বিবেচনা আছে, না কি বলেন ললিত কাকা?

উত্তরে মজুমদার মশায় বললেন,—তোমার সুবিবেচনা থাকাই তো উচিত। সেই ভরসাই তো রাখি, ননী।

মজুমদার মশায়ের কথাটা নায়েব ননী লাহিড়ীর ঠিক মনের মত হল না। সে বুদ্ধিমান লোক। আর এ নিয়ে ঘাঁটাতে চাইল না।

—আচ্ছা নায়েব মশায়, রাত হল—আমরা উঠি।

উঠে পড়ল অনিরুদ্ধ।

—হ্যাঁ, আপনাদের আবার জল ভেঙ্গে যেতে হবে। তা, আপনারা ইচ্ছে করলে এদিকে এসেও তো থাকতে পারেন। বলেন তো, সব ব্যবস্থাই করে দিই। আমাদের গাঁয়ে এসে কষ্ট পাবেন, এটা তো ঠিক নয়?

—আপনাকে ধন্যবাদ নায়েব মশায়। কষ্ট আমাদের কিছু হচ্ছে না। হলে, নিশ্চয়ই আসব।

—না, মণ্ডলের বাড়ীতে আর কষ্ট কি! দু' হাত জল বাড়লেও মণ্ডলের বাড়ীতে জল ঢুকবে না, বড় উঁচু ভিটে।

—বড় উঁচুতেই ছ্যালাম 'নাড়ি মশাই'—তোমার কালেই নীচি পড়িছি।

মণ্ডলের কথা শুনে নায়েব বলল,—এডা তুমি কি ক'লে মণ্ডল? তুমি আমাদের সক্কলের উপরে।

—হয়। চলেন বাবুরা, যাই।

মজুমদার মশায় ও নায়েবকে নমস্কার করে অনিরুদ্ধেরা বেরিয়ে গেল।

খাওয়ার পর বড় ঘরে বসে সবাই গল্প করছিল।

প্রসাদী ঘরে ঢুকে বলল,—ভুল্যা গিছিল্যাম। পিতুদা আপনির একখ্যান চিঠি দিয়্যা গিছে।

প্রসাদীর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে, খুলে পড়তে সুরু করল অনিরুদ্ধ।

—চল কত্তাদা, বাবুগরে শুব্যার দাও।

—হ্যাঁ, চল যাই।

মণ্ডল আর প্রসাদী চলে গেল।

—কি হে, কলকাতার চিঠি না কি? প্রশ্ন করল বিভাস।

—হ্যাঁ, বাড়ী থেকে এসেছে।

—ও!

একে একে শুয়ে পড়ল সবাই। অনিরুদ্ধ তখনও চিঠিটা পড়ছে।

সীতার চিঠি।

সীতাকে এখানকার ঠিকানা আর অবস্থা জানিয়েছিল অনিরুদ্ধ।

সীতা লিখেছে,—বেশ বড় চিঠি। বার বার চিঠিটা পড়ে অনিরুদ্ধ বুঝল,—অবিনাশবাবু খুব রেগে গেছেন। আর সবচেয়ে যেজন্যে সীতা তাকে কলকাতা ফিরে যেতে বলেছে—তা হচ্ছে, অবিনাশবাবু সীতার বিয়ে ঠিক করেছেন। পাত্র নাকি এক জমিদার-নন্দন। এই আষাঢ়েই বিয়ে। ক'দিন মাত্র মধ্যে আছে। তার চেয়েও বড় কথা, সীতা নিজে না কি এখনও বিয়ের সম্বন্ধে তার মনস্থির করে নি। অনিরুদ্ধের কাছে সে পরামর্শ চায়।

সীতার চিঠি পেয়ে অনিরুদ্ধ সত্যই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

প্রথমতঃ, তার নিজের এখন এখান থেকে যাওয়া অসম্ভব। কাজ যতটুকু এগিয়েছে, সে চলে গেলে—সেটুকুও বজায় থাকবে কি না সন্দেহ। এতগুলো প্রাণীকে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে সে যেতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সীতা তার পরামর্শ চায়। লিখেছে, বিয়ে সম্বন্ধে সে মনস্থির করে নি। এর সঠিক অর্থ কি, অনিরুদ্ধ বুঝতে পারল না। এই বিয়েতে তার মত নেই, না—বিয়েই সে করতে চায় না—সে সম্বন্ধে খোলাখুলি সীতা কিছু লেখে নি।

ঘুমুতে পারল না অনিরুদ্ধ।

ঘুমুতে পারে নি প্রসাদীও।

নানা কথা, নানা কল্পনা তার মনে ভেসে উঠতে লাগল।

অসম্ভব কল্পনা বুঝতে পারে সে। তবুও ভাল লাগে ভাবতে।

হঠাৎ বিছানায় মানুষের ছায়া পড়তে ভয় পেল প্রসাদী। জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে তার বিছানায়। সে আলোয় সে দেখতে গেল, একজন মানুষের ছায়া নড়ে বেড়াচ্ছে।

সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখে, প্রসাদী উঠে বসল।

মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে দেখল, উঠোনে একজন লোক হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারই ছায়া এসে পড়েছে তার বিছানায়।

অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে সে বুঝতে পারল, লোকটি নিশ্চয়ই অনিরুদ্ধ।

একবার কত্তাদার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল, বৃদ্ধ ঈশান মণ্ডল অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল প্রসাদী।

অনিরুদ্ধের পেছনে এসে বলল,—রাতি আপনার ঘুম হয় না না কি? রোজই দেখি, শেষ রাতি উঠ্যা ঘুরতিছেন, না হয়, দাওয়ার উপর বস্যা আছেন।

—ভোর বেলা ঘুম ভেঙে যায়, তাই উঠে পড়ি।

—আজ তো ভোর হয় নাই।

—না। মনটা আজ ভাল নেই প্রসাদী।

—তাই কই। কি হইছে দাদাবাবু?

প্রসাদীর কথায় স্পষ্ট দরদীর সুর। গ্রাম্য মেয়ের এই সহজ আত্মীয়তার সুর ভাল লাগল অনিরুদ্ধের।

একটু হেসে অনিরুদ্ধ বলল,—দাদাবাবু নয়, দাদা।

মাথা নীচু করল প্রসাদী।

আবার বলল অনিরুদ্ধ,—বল দাদা।

আস্তে আস্তে প্রসাদী উচ্চারণ করল,—দা-দা।

—মনটা আজ ভাল নেই প্রসাদী। সীতার চিঠি এসেছে আজ। বাবা তার বিয়ে ঠিক করেছেন।

—সীতা কিডা?

—আমার বোন।

—বিয়ে ঠিক হইছে বুনের। তা, খারাপ কথাডা কি? আমি ভাবল্যাম, না-জানি আর কি ব্যাপার?

হাসল অনিরুদ্ধ।

বলল,—না বিয়ের কথা আর খারাপ কি। তবে মুস্কিল হয়েছে যে, সীতা এখনও বিয়ে সম্বন্ধে মনস্থির করে নি। আমার পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছে। আমাকে যেতে বলেছে।

অনিরুদ্ধের কথাগুলো বোধহয় প্রসাদী ঠিক বুঝতে পারল না। তাই কোন উত্তর দিল না সে।

—আচ্ছা বল ত প্রসাদী, আমি কি উত্তর দিই?

—কিসির উত্তর?

—সীতার চিঠির।

—আমি তো আপনির বুনির কথা জানিন্যা কিছু, আমি কি কব?

—হুঁ।

—আমি কই কি, আপনি কলকাতা চল্যা যান। বুনির বিয়্যা দিয়্যা আসেন গা।

—তুমি তো বেশ সহজেই বললে চলে যেতে। কিন্তু আমি যাই

কি করে ? কাজের এখন সবে সুরু—অনেক কিছু করবার প্রয়োজন হবে। এখন আমার গেলে চলবে না।

অনিরুদ্ধ চলে যাক, প্রসাদীই কি তাই চায়।

—তা, কি করতি চান ?

—তাই তো ভাবছি। সীতা বিয়েতে কেন আপত্তির কথা লিখল ? সে বিয়েই করতে চায় না, না বাবা যে বিয়ে ঠিক করেছেন, তাতেই তার আপত্তি, বুঝতে পারছি না।

—আপুনির বুন কি অন্যখানে বিয়া করতি চায় নাকি ?

—সেটাই তো জানতে চাই।

—তাহলি তো আপনির কলকাতা যাওয়াই লাগে।

—না। কাল সমস্ত বুঝিয়ে সীতাকে চিঠি দেব। সে যদি আর কাউকে বিয়ে করতে চায়—তবে তাই যেন করে।

—আপনির বুনরে আপনি খুব ভালবাসেন ?

—হ্যাঁ বাসি। বোনকে কে না ভালবাসে ? এখানে এসে আমার আরেকটি বোন পেয়েছি, তাকেও ভালবাসি।

অনিরুদ্ধের কথা শুনে প্রসাদীর মাথা বুকের ওপর নুয়ে পড়ল। বুকের মাঝে তার দ্রুত স্পন্দনের সাড়া, আর সারা-অঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল। কেমন দুবলতা বোধ করতে লাগল সে। মনে হল, মাটির সঙ্গে যেন তার পা-দুটোও এঁটে জমাট বেঁধে গেছে। অনিরুদ্ধের সামনে থেকে চলে যাবার শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

এগিয়ে এল অনিরুদ্ধ। প্রসাদীর সামনে দাঁড়িয়ে তার দু' কাঁধে হাত রেখে বলল,—মাথা তোল। লজ্জা কি ?

রুদ্ধ আবেগে প্রসাদী বলে উঠল,—ছাই ! ছাই ভালবাসেন আমাকে। আমাগরে পর ভাবেন, তা আমি জানি।

—না, না, তুমি আর মণ্ডল—তোমাদের কথা আমি ভুলব কেমন করে !

—তা হলি পিতুদার দিয়্যা হাট থিক্যা অত তরকারি-পাতি কিন্যা দিল্যান ক্যান ?

—ও, এই জন্যে তোমার রাগ হয়েছে ? আচ্ছা, আর কোনদিন অত তরকারি কিনে দেব না। এবার হল ত ?

অনিরুদ্ধের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল প্রসাদী।

অনিরুদ্ধও হাসল।

মৃদুস্বরে প্রসাদী বলল,—আমি যাই—

—এস।

প্রসাদী আস্তে আস্তে চলে গেল।

দশ

অবিনাশবাবু সীতার বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বিয়ের দিনও স্থির হয়ে গেছে।

বিয়ের জিনিষপত্র কেনাকাটি করছেন তিনি।

সেদিন সকালে কয়েকখানা বেনারসী শাড়ি এনে স্ত্রীকে পছন্দ করতে বললেন।

শাড়িগুলো তুলে নিয়ে কমলা বলল,—যার জিনিষ তাকে দিয়েই পছন্দ করিয়ে আনি।

শাড়ি পছন্দ করা নিয়েই ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল। অবিনাশবাবু স্ত্রী-কন্যা কারোও সঙ্গেই সীতার বিয়ে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নি। নিজের বিবেচনা মতই সব ঠিক করেছেন তিনি।

বিয়ে যে ঠিক হচ্ছে, এ ব্যাপার অবশ্য গোপন নেই। কমলা জানে, সীতাও জানে।

বিয়ের দিন স্থির হয়েছে, এ খবরটা অবিনাশবাবু কমলাকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সীতাও জেনেছে।

প্রথম থেকেই কমলা মারফৎ সীতা বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিল। কমলার কাছে সে সম্বন্ধে শুনেও অবিনাশবাবু সে কথায় কোন গুরুত্ব দেননি। বরঞ্চ মেয়ের বেহায়াপনায় বিরক্ত হয়ে কঢ় মন্তব্য করেছেন।

পাত্র-পক্ষ থেকে সীতাকে কেউ দেখতে আসেনি। পাত্র নাকি সীতাকে পছন্দ করেছে। কবে, কি সূত্রে সীতাকে সে দেখেছে, তা জানা যায়নি।

পাত্র-পক্ষ থেকে ঘটক এসেছিল। পাত্রের পরিচয় পেয়ে অবিনাশবাবু খুসী মনেই এ বিয়েতে অগ্রসর হয়েছেন। পাত্রের বাড়িতে গিয়ে তার বাপ-মার সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা ও দিন-স্থির ইত্যাদি সমাধা কবে ফেলেছেন।

কনে দেখার প্রশ্নে পাত্রের বাবা বলেছেন,—ছেলে যখন পছন্দ করেছে, সে ক্ষেত্রে ও হাঙ্গামা করে লাভ কি ? তবে ক'নেকে আশীর্বাদ করতে আমি নিশ্চয়ই যাব।

কমলার মুখে পাত্রের পছন্দের কথা শুনে সীতাও কম আশ্চর্য হয়নি। কবে কিভাবে ভদ্রলোক তাকে দেখেছে, সীতা বুঝতেও পারেনি। শুধু দেখাই নয়। খোঁজ করে তার ঠিকানা জেনেছে। তারপর সরাসরি ঘটক পাঠিয়ে একেবারে বিবাহের প্রস্তাব। ভদ্রলোক অদ্ভুত লোক তো! নিজেকে সুন্দরী বলে কোনদিনই তার মনে হয়নি। অথচ ভদ্রলোকের কাণ্ড-কারখানা দেখে নিজেকে অপাংক্তেয় আর ভাবা যায় না।

পাত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও হঠাৎ কিছু করবার মত ভাবপ্রবণ নয় সীতা। বিয়ে করবে না—এই রকমই সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। পড়া-শোনা আর স্বাধীন ভাবে কাজ করবে, এই তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে পরিকল্পনা।

পিতার দ্বিতীয় বার বিবাহ, সৎমার বিবাহিত জীবন—এগুলোও তার মনে অবিবাহিত জীবন যাপন করবার পরিকল্পনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

সীতা যখন বুঝল, তার অমত জেনেও অবিনাশবাবু নিরস্ত হবেন না, তখন অনিরুদ্ধকে চিঠি লিখল সে। মনের কথা জানিয়ে, অনিরুদ্ধের মতামত চাইল ও তাকে কলকাতায় ফিরে আসতে বলল।

বাবার স্বভাব সীতা জানে। এই ব্যাপার নিয়ে তিনি যে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করে তুলবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ রকম একটা সম্ভাবনায় সম্মুখীন হবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখছিল সীতা।

কমলা সীতাকে শাড়ী পছন্দ করতে বলায়, সীতা জানাল,—ছোট-মা, বাবাকে স্পষ্ট করেই জানাতে চাই, তিনি যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে জোর না করেন।

—তোমার কথা তাঁকে না বলেছি, তা তো নয়। দেখতেই পাচ্ছ, ওঁর কাছে ওসব কথাব কোন মূল্য নেই!

—শাড়ীগুলো ফেরত দাওগে তুমি।

সংক্ষেপে কথা ক'টি বলে সীতা তার সামনে খোলা বইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কমলা তাব ঘরে ঢোকবার সময় সে পড়ছিল।

একটু অপেক্ষা করল কমলা। তারপর শাড়ীগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল,—বেশ, তাই বলিগে।

এরপর যা হবার তাই হল।

অবিনাশবাবু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতে লাগলেন। কমলার ওপর হম্বি-তম্বিও কম হল না। তাঁর বাড়িতে থাকতে হলে, তাঁর কথামত সবাইকে চলতে হবে,—বার বার এ কথা বলে শাসাতে লাগলেন।

তাঁর চিৎকার ও শাসানি, ঘরে বসে সবই সীতার কানে আসতে লাগল। সীতাকে শোনাতেই তিনি চান।

সীতা ঘর থেকে বেরোল না।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলল অবিনাশবাবুর দাপাদাপি। তারপর খেয়ে-দেয়ে তিনি একবার বেরোলেন। তখন একটু ঠাণ্ডা হল বাড়ি।

কমলা আর সীতার ঘরে আসেনি।

সারদা সীতাকে একখানা ডাকে-আসা চিঠি দিয়ে গেল।

অনিরুদ্ধের চিঠি।

অনিরুদ্ধ লিখেছে—

"স্নেহের বোন,

সীতা, তোর চিঠি পেলাম। এখানকার বন্যার কথা তোকে আগেই জানিয়েছি। এখন অবস্থা আরও ভয়াবহ। কাজ যেটুকু এগিয়েছে, আমি এ সময় চলে গেলে সেটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে। এরা অসহায়, নিপীড়িত। তাই শত ইচ্ছা থাকলেও, আমি যেতে পারলাম না বোন।

তুই আমার মতামত জানতে চেয়েছিস। তোর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যদি কোন নির্দিষ্ট সঙ্কল্প করে থাকিস,—তবে সে সম্বন্ধে তোকে নিজেকেই বিচার করতে হবে। বাবা তোর বিয়ে ঠিক করেছেন। বিয়েতেই তোর আপত্তি, না এই বিয়েতে আপত্তি—সঠিক বুঝতে পারলাম না। বাবা যে পাত্র ঠিক করেছেন, সাংসারিক ক্ষেত্রে সে পাত্র নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত—এটা ভেবে নিতে পারি। বাবা সেদিক থেকে ভুল করবেন না জানি। তোর জীবন-সাথী রূপে আর কাউকে যদি স্থির করে থাকিস,—তা হ'লে তাকেই বরণ করে নিবি। সত্যকে স্বীকার করে নিতে কোন বাধাই মানবি না। এর বেশী আমি তো আর কিছু লিখতে পারি না ভাই।

তোর সব কাজেই আমার পূর্ণ সহানুভূতি ও আশীর্বাদ রয়েছে জানবি।

ইতি

তোর দাদা।"

বিকেলের দিকে কমলা এল সীতার ঘরে।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে সীতা আরও বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছে। দাদা তার মনোভাব ঠিক বুঝতে পারে নি। হয়ত ঠিক মত দাদাকে বুঝিয়ে লিখতে পারে নি সে।

কমলাকে অনিরুদ্ধের চিঠিটা পড়তে দিল সীতা।

চিঠি পড়ে কমলা বলল,—এবার তবে কি ঠিক করলি?

—এখনও কিছু ঠিক করি নি। বল ত ছোটমা, এখন আমি কি করব? দাদা হয়ত ভেবেছে, কারো সাথে আমি প্রেমে পড়েছি!

—তাও যদি পড়তিস, আমি খুসী হতাম। তবু একটা মানে দাঁড়াত। এ তোর কি হচ্ছে বল ত? আমার মত অবস্থা ত তোর নয়? লেখা-পড়া জানা মেয়ে তুই। আমার মত পঙ্গু ত আর নস? বিয়ের নামে তোর ভয়ই বেশী।

—হ্যাঁ, ভয় করে ছোটমা। যদি বিয়েটা সুখের না হয়, সারা জীবন ধরে সে ক্লেদ ত অঙ্গে জড়িয়ে থাকবে।

—ছেলেটি নিজে এ বিয়েতে অগ্রণী হয়েছে। তোকে পছন্দ করেছে, হয়ত ভালও বেসে ফেলেছে তোকে এর মধ্যেই। তুইও যদি তাকে আপন করে নিতে পারিস, তবে সুখের বাধা কোথায়?

—বাধা যে কোথা থেকে কখন এসে উদয় হবে আগে থেকে কি তুমি তা বলতে পার ছোটমা?

—না, তা পারি না। আর তোমার সঙ্গে তর্কেও পেরে উঠব না। আমি মুখ্যু মানুষ। তবে কি করবি, ঠিক করে ফেল। এ রকম অশান্তি, রাগারাগি আর ভাল লাগে না।

—আমাকে নিয়ে আর অশান্তি হবে না ছোটমা। বাবাকে বল, এ বিয়েতে আমার অমত নেই।

—'তোকে নিয়ে অশান্তি'—আমি কি তাই বললাম রে সীতা?

তোর মত নেই শুনে সকাল থেকে তোর বাবা যা আরম্ভ করেছেন—তাই বলছি।

—আমিও ত তাই বলছি। জীবনটা নিয়ে একবার জুয়া খেলে দেখা যাক। যাও, এবার কোমর বেঁধে আমার বিদায়ের ব্যবস্থায় লেগে যাও। খবরটা শুনিয়ে বাবাকে ঠাণ্ডা করগে।

কমলা হেসে ফেলে বলল,—মেয়ের কথাগুলোই বাঁকা বাঁকা। আর দাদাটি ত ঘেন্নায় আমার সঙ্গে কথাই বলে না।

—আহা, তাই নাকি! তুমিই ত দাদার সঙ্গে কথা বলতে চাও না। বুঝলে, দাদার মন অত ছোট নয়।

—দাদার নামে কিছু বললেই অমনি মেয়ে ফোঁস করে ওঠে।

—দাদার সঙ্গে আলাপ কবলে বুঝতে পারতে, দাদা কি? বাবার মত কেন দাদা হল না, তাই বাবাব রাগ।

—তোর দাদার মত যদি আমার একটা দাদাও থাকত! তোকে আমার হিংসে হয়, সীতা।

—তা ত হবেই, সৎমা কি না?

কমলা হেসে বলল,—হ্যাঁরে, ঠিক তাই।

সীতাও হেসে ফেলে দু হাতে কমলাকে জড়িয়ে ধরল।

—ছাড়, ছাড়, আমার এখন অনেক কাজ। তোর এমনি করে জড়িয়ে ধবার লোকটিকে আনবারই ত ব্যবস্থা করছি।

কমলাকে ছেড়ে দিয়ে সীতা বলল,—ধ্যেৎ, অসভ্য।

হাসতে হাসতে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কনেকে আশীর্বাদ করতে আসবেন, ছেলের বাবা খবর পাঠিয়েছেন।

সেদিন বাড়ীতে এক দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে তুললেন অবিনাশবাবু।

বড়লোক আত্মীয়কে কি ভাবে আপ্যায়িত করবেন, সেই তোড়-জোড় চলল সারাদিন ধরে।

বিকেলে এক মস্ত গাড়ীতে করে এলেন সীতার ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ী।

দুজনেই বেশ অমায়িক। বড়মানুষি চাল-চলন নেই তাঁদের কথা-বার্তায়।

হীরা-সেট করা খুব দামী নেকলেস দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করলেন শাশুড়ী। সীতাকে দেখে, প্রকাশ্যেই তাঁদের ছেলের পছন্দের তারিফ করলেন। লজ্জায় মাথা নীচু করল সীতা।

এক সময় সীতাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করে বসলেন বরের মা—প্রবীরের সাথে তোমার কতদিনের আলাপ মা?

—তাঁকে ত আমি আজ পর্যন্ত দেখিইনি।

—দেখোনি তুমি প্রবীরকে? অথচ—আচ্ছা পাগল ছেলে আমার!

কথা তিনি শেষ করলেন না। তারপর অন্য কথায় ফিরে গেলেন তিনি।

প্রবীরকে যে সীতা দেখেনি, এ খবরটা স্বামীকে জানাতেই হো হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

সীতাও সেখানে বসে।

ভদ্রলোক বললেন,—আজকালকার ছেলে হলে কি হবে,—প্রবীরটা বড্ড বোকা। যাকে বিয়ে করবার জন্য তুই পাগল হয়েছিস, তার সঙ্গে দেখা করবার সাহসটাও তোর নেই? আমরা অন্ততঃ এত বোকা ছিলাম না। আয়েষার কোন জগৎসিংহ আছে কি না, সে খবরটা নেওয়াও যে দরকার রে বোকা!

কথা শেষ করে আবার জোরে হেসে উঠলেন তিনি।

বয়স্ক লোকেদের তাদের ছেলে মেয়ে সম্বন্ধে এরকম খোলা-খুলি

কথা বলতে কখনও শোনেনি সীতা। তাঁর ভাবী শ্বশুর বাবার মত নয়। ভদ্রলোককে ভাল লাগল সীতার।

ওঁরা চলে গেলে, কমলাকে বললেন অবিনাশবাবু,—দেখে নিও, মেয়ে এবার ওসব হুজুগেবাই ছেড়ে দেবে। যত সব হুজুগ-মাতানো অপদার্থের দল! ঐ ঘর-বরে যে ওর বিয়ে হচ্ছে, এটা ওর মস্ত ভাগ্যি।

অবিনাশবাবুর কথায় কমলা কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেল।

কমলার এই ধরনের ব্যবহারে অবিনাশবাবু চটে যান। অনিরুদ্ধ আর সীতার প্রভাব যে কমলার মনের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা বুঝতে পারেন তিনি। আর সেইজন্যই তাঁর বিক্ষোভ আরও বেশী।

কমলা গরীবের মেয়ে। অল্পশিক্ষিতা। অবিনাশবাবু ভেবে-ছিলেন, কমলা তাঁর সচ্ছল সংসারের কর্ত্রী হয়ে বসে, নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু তা হল না,—কমলা উল্টো পথে গেল।

কমলা যে কতদূর অধঃপাতে গেছে অবিনাশবাবু সেদিন বুঝলেন, যখন কমলা বলে ফেলল, এতবড় ছেলেমেয়ে থাকতে, এ বয়সে তাঁর বিয়ে করা উচিত হয়নি।

সীতার বিয়ে স্থির হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন অবিনাশবাবু। সীতার প্রভাবমুক্ত হলে, কমলাকে হয়ত তিনি পোষ মানাতে পারবেন।

এগারো

বিয়ের পর সীতা শ্বশুরবাড়িতে চলে গেছে। শ্বশুরবাড়িতেও সে এখন নেই। প্রবীর আর সীতা দেশভ্রমণে বেরিয়েছে।

সম্প্রতি সীতার একখানা চিঠি পেয়েছে কমলা। তারা এখন আগ্রায়।

সমস্ত চিঠিখানা তাজমহলের বর্ণনায় ভরা। আর সীতার চিঠির ভাষাও উচ্ছ্বাসে ভরপুর।

কমলা একটু হাসল।

সীতার মন এখন আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ। সে আনন্দের ভারে টলমল মনের ছায়া পড়েছে তার চিঠির ভাষায়। প্রবীরকে পেয়ে সীতা সুখী হয়েছে, সন্দেহ নেই।

কমলার এখন বড় একা একা লাগে। সারাদিন এটা-ওটা কাজ করে, সময় যেন তবুও ভারী হয়ে ওঠে, কাটতে চায় না।

সীতা অভিযোগ জানিয়েছে, কমলা কেন সংক্ষেপে মাত্র ক'লাইনে চিঠির উত্তর দেয়? অত সংক্ষেপ উত্তর সীতার পছন্দ হয় না। সমস্ত খবর জানিয়ে বড় করে চিঠি দিতে বলেছে কমলাকে তাড়াতাড়ি।

সীতাকে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার কোন প্রেরণা পাচ্ছে না কমলা। সীতা লিখেছে, পূর্ণিমার আলোয় তাজ দেখবার জন্যে তারা পূর্ণিমা পর্যন্ত আগ্রায় থাকবে। পূর্ণিমায় চাঁদের আলো তাজকে নাকি অপরূপ করে তোলে।

পূর্ণিমার এখনও ক'দিন দেরি আছে। সীতাকে এখনই উত্তর দেবার তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে সীতার চিঠির উত্তর দেবে, ভাবল কমলা।

সেদিন বিকেলে কমলাকে ডেকে পাঠালেন অবিনাশবাবু।

কমলা তাঁর ঘরে ঢুকে দেখল, অবিনাশবাবু চুপ করে ইজিচেয়ারে চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন।

তাকে বললেন,—চেয়ারটা টেনে নিয়ে কাছে এসে বস ছোটবৌ।

অবিনাশবাবুর শান্ত ক্ষীণ স্বর শুনে বিস্মিত হ'ল কমলা। সাধারণতঃ এত শান্তভাবে কথা বলেন না অবিনাশবাবু।

তিনি আবার বললেন,—কই, বস ?

চেয়ারটা অবিনাশবাবুর দিকে একটু টেনে নিয়ে বসল কমলা।

কিছুক্ষণ অবিনাশবাবু কোন কথা বললেন না। পূর্বের মত চোখ বুঁজে শুয়েই থাকলেন।

—সীতা শ্বশুরবাড়ি যাবার পর থেকে তোমার বেশ অসুবিধা হয়েছে, না ?

ধীরে ধীরে বললেন অবিনাশবাবু।

কমলা কোন উত্তর দিল না।

—মেয়েটার ব্যবহার দেখ। বিয়ের পর সেই যে গেল, কেমন আছে না আছে, একটা খবরও দিল না।

—চিঠি দিয়েছে সীতা। ওরা এখন আগ্রায় আছে। মেয়ে-জামাই বেড়াতে গিয়েছে।

—তোমাকে সে চিঠি দেয়, তা জানি।

—কে কেমন আছে সব খবরই সে জানতে চেয়েছে।

—হুঁ।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অবিনাশবাবু।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

—সবই আমার কপাল, বুঝলে ছোটবৌ! বাপের কর্তব্য কি না আমি করেছি ? ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, কোন দিন কোন অভাব বুঝতে দিইনি। লেখাপড়া শিখে সে মানুষ হবে, এই না আমার আশা ছিল! কিন্তু কি হ'ল ? অত ভালভাবে এম. এ. পাশ করল। যে কোন ভাল চাকরি সে পেতে পারত। তা নয়,

হৈ-হৈ করে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করছে। আর মেয়েটা এমনই স্বার্থপর যে, বাবাকে সে ভুলে গেছে। ভাল ঘর-বরে তোর বিয়ে দিয়েছি,—সে ত তোর ভবিষ্যৎ যাতে সুখের হয়, সেই ভেবেই না করেছি? তোদের ওপর চেঁচামিচি করেছি, সে ত তোদের ভালোর জন্যেই। আজ বাবাকে একখানা পোস্ট-কার্ড দিয়েও জিজ্ঞাসা করে না,—বাবা কেমন আছে?

বলতে বলতে অবিনাশবাবুর গলা ভারী হয়ে এল।

কমলাও লজ্জিত হল। বলল,—নিশ্চয়ই সীতার এ বড় অন্যায়। আমি তাকে লিখে দেব, তোমাকে চিঠি দিতে।

—না, লিখ না।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কলকাতায় কবে ফিরবে, কিছু লিখেছে?

—না। তারা এখন আরও অনেক জায়গায় যাবে। আগ্রা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে আবার চিঠি দেবে জানিয়েছে।

—হুঁ। আমি খুব গরীবের ছেলে ছিলাম, ছোটবৌ। অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি ছোটবেলায়। রোজ দুবেলা পেট ভরে ভাতও জুটত না। শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে আমাকে রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে হয়েছে খুব কম বয়স থেকেই। লেখা-পড়া তাই শিখিনি। সমস্ত জীবনটাই আমার একটানা পরিশ্রমের গাঁথুনি। কর্তব্যে অবহেলা করিনি,—সময়কে অপচয় করতে পারিনি। আজকালকার ছেলে-মেয়ের চালচলন তাই আমার পছন্দ হয় না। কেমন যেন সব ঢিলে-ঢালা ভাব। কর্তব্য ছেড়ে হুজুগে বেশী ঝোঁক।

—তুমি যাকে হুজুগ বল, সেটাকেই হয়ত তারা কর্তব্য বলে জানে।

—জানে না তারা কিছুই। এই যে সীতা বিয়ে করবে না বলে ঝোঁক ধরেছিল, বিয়ের পর সে কি খুব অসুখী হয়েছে বলে তোমায় লিখেছে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে কমলা বলল,—আমাকে তুমি কেন ডেকেছ ?

—ডেকেছি, ভাবছি, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসব। কাশী, বৃন্দাবন, আর এদিকে গয়া। গয়ায় গিয়ে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করবার বাসনাও আছে। একবার চল, দু'জনে বেরিয়ে পড়ি।

—আমি যাব ?

—হ্যাঁ, তুমিও চল। কেন, আপত্তি আছে নাকি তোমার ?

—এখানে বাড়িতে কে থাকবে ?

—কেউ না। তালা বন্ধ করে যাব।

—অনিরুদ্ধ যদি এর মধ্যে ফিরে আসে, সে কোথায় থাকবে ?

—তার থাকবার জায়গার অভাব কি ? তার জন্যে চিন্তা না করলেও চলবে।

—এটা কি স্বার্থপরতা হ'ল না ?

—আমি স্বার্থপর, আমি তোমাকে বিয়ে করে অন্যায় করেছি,—এই সব কথাই তোমার কাছে শুনে আসছি। কিন্তু এই যে আমি সকাল থেকে জ্বর হয়ে পড়ে আছি—একবার খোঁজ নেওয়াও কর্তব্য বলে মনে করনি ? সাধারণ ভদ্রতাবশেও ত লোকে খোঁজ খবর নেয় !

—তোমার জ্বর হয়েছে,—আমি এ কথা ত জানি না।

—জানবার গরজ কোথায় তোমার ? আজকালকার মেয়ে তোমরা—শুধু মুখে বড় বড় কথা বলতে শিখেছ। কিন্তু বড় বড় কথা বলেই কি নিজেকে বড় করে তোলা যায় ? কি তোমাদের শিক্ষা, কি তোমাদের ত্যাগ—হৃদয় কোথায় তোমাদের ?

—আমার অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করছি। তুমি একটু চুপ কর।

চেয়ার থেকে উঠে এসে অবিনাশবাবুর কপালে হাত দিয়ে কমলা বলল,—এখনও ত জ্বর রয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই।

—না, অত সহজে আমার ডাক্তারের দরকার হয় না। এমনিতেই সেরে যাবে। তুমি বস।

—আমি বসলেই ত তুমি আবার বক বক ক'রে অসুখ বাড়িয়ে তুলবে।

—বক বক কি আমি সাধে করি ?

কমলা বসল না। দাঁড়িয়ে স্বামীর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

অবিনাশবাবু চোখ বুঁজে কমলার সেবা গ্রহণ করতে লাগলেন।

একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন,—সীতার মা কতদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে, কিন্তু আমাকে কোনদিন হেনস্তা করে নি। আমি মুখ্যু মানুষ। চাষার মত খাটতে পারি—আর মেজাজটাও ঠিক চাষার মত রয়ে গেল। লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে মুখ্যু বাবাকে সম্মান করবে কেন ? আজকালকার শিক্ষাই যে আলাদা। আর তোমাকেই বা কি দোষ দেব ? সবাই ত আজকালকার ছেলেমেয়ে তোমরা। আমারই ভুল হয়েছে। আমার বিয়ে করাই উচিত হয় নি। সীতার মায়ের মৃত্যুর পর বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, বিয়ে করলে হয়ত আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। পুরনো আদর্শ ছিল মনের পাতায়, আর দৃষ্টান্ত ছিল চোখের সামনে। কিন্তু তখন ভাবিনি—দিন বদলে গেছে। নূতন মানুষের সঙ্গে পুরনো মানুষের যে কোন মিল থাকবে না,—তা ভাবিনি।

—আমাকে শুধুই তুমি দোষ দিচ্ছ। তোমাকে হেনস্থা করব, এ কথা আমার মনেও আসে না। বিয়ের পর এসে দেখলাম, আমার বয়সী অবিবাহিত মেয়ে তোমার ঘরে। তোমার ছেলে আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার গরীব বাবা হয়ত ভাল বিয়ে আমায় দিতে পারতেন না, কিন্তু এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়ব কল্পনা করিনি। তারপর দেখলাম, ছেলেমেয়ের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব নেই।

সে কথার উত্তর না দিয়ে কমলা বলল,—আমাকে তুমি কেন ডেকেছ?

—ডেকেছি, ভাবছি, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসব। কাশী, বৃন্দাবন, আর এদিকে গয়া। গয়ায় গিয়ে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করবার বাসনাও আছে। একবার চল, দু'জনে বেরিয়ে পড়ি।

—আমি যাব?

—হ্যাঁ, তুমিও চল। কেন, আপত্তি আছে নাকি তোমার?

—এখানে বাড়িতে কে থাকবে?

—কেউ না। তালা বন্ধ করে যাব।

—অনিরুদ্ধ যদি এর মধ্যে ফিরে আসে, সে কোথায় থাকবে?

—তার থাকবার জায়গার অভাব কি? তার জন্যে চিন্তা না করলেও চলবে।

—এটা কি স্বার্থপরতা হ'ল না?

—আমি স্বার্থপর, আমি তোমাকে বিয়ে করে অন্যায় করেছি,—এই সব কথাই তোমার কাছে শুনে আসছি। কিন্তু এই যে আমি সকাল থেকে জ্বর হয়ে পড়ে আছি—একবার খোঁজ নেওয়াও কর্তব্য বলে মনে করনি? সাধারণ ভদ্রতাবশেও ত লোকে খোঁজ খবর নেয়!

—তোমার জ্বর হয়েছে,—আমি এ কথা ত জানি না।

—জানবার গরজ কোথায় তোমার? আজকালকার মেয়ে তোমরা—শুধু মুখে বড় বড় কথা বলতে শিখেছ। কিন্তু বড় বড় কথা বলেই কি নিজেকে বড় করে তোলা যায়? কি তোমাদের শিক্ষা, কি তোমাদের ত্যাগ—হৃদয় কোথায় তোমাদের?

—আমার অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করছি। তুমি একটু চুপ কর।

চেয়ার থেকে উঠে এসে অবিনাশবাবুর কপালে হাত দিয়ে কমলা বলল,—এখনও ত জ্বর রয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই।

—না, অত সহজে আমার ডাক্তারের দরকার হয় না। এমনিতেই সেরে যাবে। তুমি বস।

—আমি বসলেই ত তুমি আবার বক বক ক'রে অসুখ বাড়িয়ে তুলবে।

—বক বক কি আমি সাধে করি?

কমলা বসল না। দাঁড়িয়ে স্বামীর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

অবিনাশবাবু চোখ বুঁজে কমলার সেবা গ্রহণ করতে লাগলেন।

একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন,—সীতার মা কতদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে, কিন্তু আমাকে কোনদিন হেনস্তা করে নি। আমি মুখ্যু মানুষ। চাষার মত খাটতে পারি—আর মেজাজটাও ঠিক চাষার মত রয়ে গেল। লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে মুখ্যু বাবাকে সম্মান করবে কেন? আজকালকার শিক্ষাই যে আলাদা। আর তোমাকেই বা কি দোষ দেব? সবাই ত আজকালকার ছেলেমেয়ে তোমরা। আমারই ভুল হয়েছে। আমার বিয়ে করাই উচিত হয় নি। সীতার মায়ের মৃত্যুর পর বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, বিয়ে করলে হয়ত আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। পুরনো আদর্শ ছিল মনের পাতায়, আর দৃষ্টান্ত ছিল চোখের সামনে। কিন্তু তখন ভাবিনি—দিন বদলে গেছে। নূতন মানুষের সঙ্গে পুরনো মানুষের যে কোন মিল থাকবে না,—তা ভাবিনি।

—আমাকে শুধুই তুমি দোষ দিচ্ছ। তোমাকে হেনস্থা করব, এ কথা আমার মনেও আসে না। বিয়ের পর এসে দেখলাম, আমার বয়সী অবিবাহিত মেয়ে তোমার ঘরে। তোমার ছেলে আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার গরীব বাবা হয়ত ভাল বিয়ে আমায় দিতে পারতেন না, কিন্তু এমন একটা অবস্থার মধ্যে এস পড়ব কল্পনা করিনি। তারপর দেখলাম, ছেলেমেয়ের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব নেই।

এই বিয়ের পর, তাদের চোখে তুমি নিজেকে আরও হেয় ক'রে তুললে। নিজের সুখ-সুবিধা আর দাবীটাই তুমি বড় করে দেখতে অভ্যস্ত। পারলাম না সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে। তোমার নির্লজ্জতা আর অসহিষ্ণু ব্যবহারে আমি আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। তুমি হয়ত আমার ওপর রেগে যাচ্ছ—কিন্তু সত্যটাই আজ প্রকাশ করলাম।

আস্তে আস্তে বললেন অবিনাশবাবু,—না, রাগিনি। তুমি যে আমায় ঘৃণা কর, তা আমি জানি ছোটবৌ। আমারই দোষ, তাও বুঝতে পারছি। কিন্তু সবই আমার ভাগ্যের লিখন।

অবিনাশবাবুর কথার ধরনে আজ কমলাও বিচলিত হ'য়ে পড়েছে। ভদ্রলোক বাহ্যত যত হুঙ্কার করেন, ভেতরে ততখানি দুর্বল।

কমলা বলল,—ও সব কথা এখন থাক্। তুমি ঘুমুতে চেষ্টা কর, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

অবিনাশবাবু যেমন চোখ বুঁজে পড়ে ছিলেন, তেমনি ভাবেই থাকলেন। উত্তর দিলেন না কিছু। কমলা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আঁধার নেমে এল। কমলা ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

অবিনাশবাবু বললেন,—শরীরটা যেন বড্ড খারাপ লাগছে,—আমি বিছানায় গিয়ে শোব।

অবিনাশবাবু ইজিচেয়ার থেকে উঠে বিছানায় গিয়ে শুলেন।

কমলা বলল,—আমি থার্মোমিটারটা নিয়ে আসছি।

অনিরুদ্ধের ঘরে থার্মোমিটার ছিল। সীতা শ্বশুর-বাড়ি যাবার পর অনিরুদ্ধের ঘর ঝাড়-পোঁছ কমলাই করে। অনিরুদ্ধের ঘরে ফার্স্ট-এইডের সরঞ্জাম, কিছু দরকারী ওষুধ সবসময়েই মজুত থাকে।

থার্মোমিটারও থাকে দু'টো করে। ইতিপূর্বে অনিরুদ্ধের অনুপস্থিতিতে সীতার সঙ্গে দু'একবার সে ঘরে এসেছে কমলা। কিন্তু ঘরে কোথায় কি থাকে না থাকে—সে খোঁজ কোন দিন করেনি। প্রয়োজনও হয়নি। সীতা চলে যাবার পর, ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে সব দেখেছে কমলা। সেই থার্মোমিটারের একটা নিয়ে এল সে।

অবিনাশবাবুর জ্বর দেখা গেল প্রায় দু ডিগ্রীর কাছে।

কমলা ঝিকে ডেকে কিছু পয়সা দিয়ে বলল,—বাবুর জ্বর খুব বেশী, রাত্রে রান্না করতে পারব না। তুই কিছু খাবার এনে খা।

—আপনি খাবেন না?

—না। তুই যা। আর অমনি ডাক্তারবাবুকেও একবার খবর দিয়ে আয়। বলবি, বাবুর অসুখ, একটু তাড়াতাড়ি উনি যেন আসেন।

ডাক্তার বোস এ বাড়ির পুরোনো ডাক্তার। কাছেই তার চেম্বার।

সারদা ঝিকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে, কমলা এসে অবিনাশবাবুর মাথার কাছে বসল।

—তোমার কি শীত করছে?

অবিনাশবাবুর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল কমলা।

—না, শীত নয়। তবে বড্ড জ্বালা করছে বুকের মধ্যে।

—আমি ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

অবিনাশবাবুর বুকে হাত দিল কমলা।

—আঃ! তোমার হাত বড় ঠাণ্ডা।

কমলার হাতখানা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলেন অবিনাশবাবু।

ডাক্তার এসে যথারীতি অবিনাশবাবুকে পরীক্ষা করল।

বলল,—জ্বরটা বোধহয় রাত্রে আরও বাড়বে। বুকেও সামান্য

প্যাচ পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। বুকে হাওয়া লাগাবেন না। মাথায় হাওয়া দিতে পারেন। কাল সকালে আমাকে খবর পাঠাবেন।

সারদা গেল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওষুধ আনতে।

সারা রাত্রির মধ্যে কমলা অবিনাশবাবুর মাথার কাছ থেকে উঠল না। রাত্রে জ্বর আরও বাড়ল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল কমলার। বসে বসেই খাটের বাজুতে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছিল সে।

জল খেতে চাইলেন অবিনাশবাবু।

কমলার ঘুম ভাঙ্গল না।

অবিনাশবাবু মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন, কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে।

কমলাকে ডাকলেন,—ছোটবৌ! ছোটবৌ!

কমলার তন্দ্রা ছুটে গেল। সোজা হয়ে বসে বলল,—এঁ্যা, কি বলছ?

—এখন রাত কটা?

ঘড়ি ছিল পেছনের দেওয়ালে টাঙ্গানো। দেখে কমলা বলল,—রাত আর নেই। ভোর পাঁচটা।

—তুমি সারারাত এখানে বসেছিলে?

—হঁ্যা। কেন বল ত?

—তোমার যে অসুখ করবে ছোটবৌ!

—তুমি ভাল হয়ে ওঠ ত আগে।

অবিনাশবাবুর কপালে হাত দিয়ে বলল,—জ্বরটা বোধহয় তোমার কমেছে একটু। কপালটা ঘামছে।

—হঁ্যা, ভাল লাগছে এখন। জল দাও একটু, খাব।

অবিনাশবাবুর খাবার জল গরম করে থার্মোফ্লাস্কে রেখে দিয়েছিল কমলা। ডাক্তার ঠাণ্ডা জল দিতে নিষেধ করেছিল। থার্মোফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে এনে অবিনাশবাবুকে চামচে করে খাইয়ে দিল।

অবিনাশবাবু বললেন,—আমি তো এখন ভালই আছি। তুমি যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গে। না হলে, তুমি আবার অসুখে পড়ে যাবে।

—সকালবেলা আমার ঘুম হবে না। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমার কিচ্ছু হবে না।

অবিনাশবাবু আর কিছু বললেন না।

অবিনাশবাবুর রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অসুখটা তাঁর নিমুনিয়া।

ডাক্তার বোস একজন নার্সের ব্যবস্থা করলেন। নার্স থাকলেও কমলার খাটুনি কিছুমাত্র কমল না।

সেদিন কমলা অবিনাশবাবুর কাছে একলাই ছিল। নার্স খেতে গিয়েছিল। অবিনাশবাবু এক কাণ্ড করে বসলেন।

কমলার হাত দুটো ধরে তিনি বললেন,—ছোট বৌ, তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখও আমার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি, দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তোমার যে ক্ষতি করে গেলাম, তার জন্যে মন আমার অনুশোচনায় ভরে উঠেছে।

—আবার তুমি যা-তা বলতে আরম্ভ করেছ। একটু শান্ত হও। আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, ভগবানকে শুধু এই প্রার্থনা দিনরাত করছি। তুমি আর কথা বল না।

—আমাকে বলতে দাও। এর পর হয়ত সময় পাব না। এতদিন সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। নিজের দিকটাই শুধু দেখেছি। তোমার কাছে শুধু প্রত্যাশাই করে এসেছি। শুধু আত্ম-সুখের আশায় তোমার কচি জীবনটা নষ্ট করে দিলাম। আমায় কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে ছোট বৌ?

—ওগো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, একটু শান্ত হও!

উপুড় হয়ে অবিনাশবাবুর হাত দুটির মধ্যে নিজের মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল কমলা।

বারো

সেদিন ছিল হাটবার।

রমণী পিওনের কাছ থেকে অনিরুদ্ধের নামে একখানা চিঠি নিয়ে এল পীতাম্বর মাঝি।

অনিরুদ্ধ তখন ছিল জমিদারের আট-চালায়। আরও অনেকে ছিল সেখানে। পীতাম্বর চিঠিটা অনিরুদ্ধকে দিল।

চিঠিটা খুলে অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখে, প্রেরকের নাম পড়ল অনিরুদ্ধ। 'কমলাবালা দেবী' সই রয়েছে চিঠির নীচে। কে 'কমলাবালা দেবী' চিনতে পারল না সে।

চিঠিটা সে পড়তে সুরু করল। বুঝতে পারল, তার সৎমার চিঠি। সৎমার নাম জানত না অনিরুদ্ধ।

ছোট্ট চিঠি। বাবার বাড়াবাড়ি অসুখের খবর জানিয়ে অবিলম্বে অনিরুদ্ধকে কলকাতায় ফিরতে অনুরোধ করেছেন তিনি।

চিঠির মর্মার্থ শুনল সবাই।

অনিরুদ্ধকে অবিলম্বে কলকাতা ফিরতে উপদেশ দিল তারা। বিশেষ করে নায়েব মশায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। কালই যে অনিরুদ্ধের রওয়ানা হয়ে যাওয়া উচিত—এ কথা নায়েব মশায় বার বার বলে, সকলের সমর্থন চাইল। বাবার অসুখের খবর শুনে কেউ যে তাকে থাকতে বলবে না—এ জানা কথা। নায়েবের আগ্রহ যেন বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠল।

নায়েবের ব্যস্ততা দেখে হাসল অনিরুদ্ধ।

নায়েব মশায় যে চায় না অনিরুদ্ধ এখানে বেশী দিন থাকুক, সে কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। তবে গোপনে গোপনে যে নায়েব মশায় তার উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করতে অন্য ব্যবস্থা করছে, সে খবর জানে না গাঁয়ের লোক। অনিরুদ্ধ জানতে পেরেও বলে নি কাউকে।

দু দিন আগে হঠাৎ দারোগাবাবু অনিরুদ্ধকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিল।

দারোগা লোকটি মন্দ নয়। বেশ খোলাখুলিভাবেই অনিরুদ্ধের সঙ্গে আলাপ করল।

বন্যার জন্যে অনিরুদ্ধেরা যা করেছে, সেজন্যে তাদের যথেষ্ট প্রশংসাও করল দারোগাবাবু।

শেষে বলল,—জল তো অনেক কমে গেছে। এবার বোধ হয় আপনাদের আর কষ্ট করে এখানে থাকতে হবে না।

দারোগা কি বলতে চায়, বুঝল অনিরুদ্ধ।

বলল,—জল সরে গিয়ে রোগ দেখা দেবে মনে হয়। তাই আরও কিছুদিন হয়ত থেকে যেতে হবে।

—বর্ষা বেশী হলে, রোগ বড় একটা দেখা যায় না। আবর্জনা-ময়লা সব ধুয়ে যায় কি না।

—রোগ না হলে তো ভালই।

—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম, কেন আর কষ্ট করে এখানে পড়ে থাকবেন ?

—এই কথা বলতেই কি আপনি আমাকে ডেকেছেন ?

—আপনি বুদ্ধিমান। সত্য গোপন করে লাভ নেই, বুঝেছেন আপনি ঠিকই। কথাটা স্পষ্ট করেই এবার বলি,—আপনারা এবার এখান থেকে চলে যান। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি ভাল ভাবেই আপনাদের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি। আপনারা যে অন্ততঃ পলিটিক্স্ করছেন না এখানে, তা আমি জানি। কিন্তু আমার জানায় কিছু এসে যাবে না অনিরুদ্ধবাবু। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক অপ্রীতিকর কাজ আমাদের করতে হয়, শুধু চাকরি বাঁচাতে।

—আপনাকে ধন্যবাদ দারোগাবাবু। আমাদের এখানে থাকা কারও কাছে অনভিপ্রেত হলেও, এতটা যে গড়াবে তা ভাবি না।

—আপনি যখন সবই বুঝে ফেলেছেন, এটুকুও নিশ্চয় বিশ্বাস করেছেন,—আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

—আপনি এখনও অমানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি দেখে, সত্যিই খুসী হয়েছি।

—কি ঠিক করলেন ?

—আরও কয়েকটা দিন তো থাকতেই হবে দারোগাবাবু।

—থাকুন, কিন্তু বেশী দেরি করবেন না। সদর থেকে আবার আমার ওপর চাপ না আসে।

থানা থেকে ফিরে এলে, দারোগা কেন ডেকেছিল জানতে চাইল অনেকেই।

অনিরুদ্ধ সত্য কথা প্রকাশ কবে নি। দারোগা যে তাদের কাজের জন্যে প্রশংসা করেছে—সেই কথায় সবাইকে জানিয়েছিল।

নায়েব অনিরুদ্ধকে সরাতে চেয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি আর এভাবে তার উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে দেখে খুসী হল সে।

সবার কথার উত্তরে অনিরুদ্ধ বলল,—হ্যাঁ, এবার যেতেই হবে। জলও তো কমে এসেছে অনেক,—আমার কাজও বড় বেশী নেই। শুধু খাজনা মাপের অনুরোধটা যদি জমিদারবাবু শুনতেন—এরা সবাই স্বস্তি পেত।

নায়েব মশায় বলে উঠল,—জমিদারবাবুর ওপর আপনি অবিচার করছেন অনিরুদ্ধবাবু। তিনি অন্যায় তো কিছু বলেন নি।

—এবার কলকাতা গিয়ে, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করব। দেখি তিনি মত বদলান কি না ?

—তিনি যদি আপনার আব্দারে মত দেন, আমার আর কি বলবার আছে ? দেখুন চেষ্টা করে।

—আব্দারের কথাটা ঠিকই বলেছেন নায়েব মশায়। জমিদারের কাছে প্রজা সন্তানতুল্য। সন্তানেরা তাঁর কাছে আব্দার করবার দাবী রাখে বই কি!

—রাত হল, আমাকে এবার উঠতে হয়। তা হলে আপনি কালই যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, কালই যাব। বাবা একটু সুস্থ হলেই ফিরে আসব।

—ফিরে আসবেন আবার ?

—আপনি কি আমাকে এতই অমানুষ ঠাউরেছেন যে, আপনাদের এত প্রীতি, ভালবাসা আমি সব ভুলে যাব ? আমার তো ইচ্ছে হয়, এখানেই একখানা ঘর বেঁধে আপনাদের মধ্যে থেকে যাই। দেবেন এক টুকরো জমি আমাকে ?

—কলকাতা গিয়ে জমিদারবাবুর কাছ থেকেই চেয়ে নেবেন।

—তাই নেব।

—আচ্ছা, আমি উঠি এবার।

চলে গেল নায়েব মশায়।

নায়েব চলে যেতেই হেসে উঠল অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের সে হাসিতে আরও দু'চারজন যোগ দিল।

পীতাম্বরকে অনিরুদ্ধ বলল,—কাল যে আমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে হবে পীতাম্বর !

—নিচ্চয় দেব। সকালেই নাওতি উঠব্যান, না একটু বেলা হলি রওনা হব্যান ?

—চল, মণ্ডলের বাড়ীতে গিয়ে সে সব ঠিক করব।

পীতাম্বরের সঙ্গে অনিরুদ্ধ-বিভাসরা আটচালা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মণ্ডল সব শুনে বলল,—তালি তো কালই আপনার যাওয়া লাগে।

অনিরুদ্ধ বলল,—হ্যাঁ কালই আমরা সবাই চলে যাব। আমাদের আর বিশেষ কিছু করবারও তো এখন নেই। মজুমদার মশায় রইলেন, ডাক্তারবাবুও রইলেন এখানে। কলকাতা গিয়ে

জমিদার মশায়কে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে খাজনার ব্যাপারে একটা সুরাহা করতে পারি কিনা চেষ্টা করব। আমার মনে হয়, সত্যি খবর সব তিনি পান নি।

—মহিন্দির রায় লোক ভাল। সব জানলি পরে, একটা বিহিত করবিই সে। আমার কথাডাও কব্যান তাক্।

—বলব।

পীতাম্বরকে বলল অনিরুদ্ধ,—কাল সকালেই তুমি নৌকা নিয়ে সুজানগরের গোলার নীচে থাকবে।

জল কমে যাওয়ায়, মণ্ডলের পালানের নীচে আর নৌকা লাগে না। সুজানগরের গোলা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে নৌকায় উঠতে হয়।

—আচ্ছা, আমি সকাল বেলাতেই নাও নিয়ে হাজির থাকব। এ্যাখন তয় আমি যাই।

চলে গেল পীতাম্বর।

খুব ভোরে উঠেছে প্রসাদী।

বাসি কাজ সেরে রান্না চাপিয়েছে সে অনিরুদ্ধেরা খেয়ে যাবে

অনিরুদ্ধ ঘুম থেকে উঠে দেখল, রান্নাঘরে কাজ করছে প্রসাদী।

রান্নাঘরের সামনে এসে সে বলল, —আমার চা!

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিল প্রসাদী,—দিচ্ছি।

কাল অনিরুদ্ধদের চলে যাবার খবর শোনার পর থেকে প্রসাদী যেন অনিরুদ্ধকে এড়িয়ে চলছে। অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করল,—তার সে স্বতঃস্ফূর্ততা আর নেই। কথা জিজ্ঞাসা করলেও, সংক্ষেপে এক-আধটা কথায় জবাব দেয়।

অনিরুদ্ধ একটু ইতস্ততঃ করে রান্নাঘরের সামনে থেকে চলে এল। বড় ঘরের দাওয়ায় এসে সে বসল।

ইতিমধ্যে বিভাস আর অজয়ও উঠে এসে বসল অনিরুদ্ধের পাশে।

প্রসাদী অনিরুদ্ধের হাতে এক কাপ চা দিয়ে বলল,—আপনিরা হাত মুখ ধুয়ে নেন, আপনাদের চা আন্যা দিচ্ছি।

অজয় অনিলকে ডেকে বলল,—ওঠরে অনিল, চা হয়ে গেছে।

প্রসাদী আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

তেরো

মণ্ডলের বাড়ীতে একে একে অনেকেই এসে জুটল।

অনিরুদ্ধেরা যে চলে যাচ্ছে, রাত্রের মধ্যেই সে খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা গ্রামে। তাই সবাই দেখা করতে এসেছে তাদের সঙ্গে।

মণ্ডলের পালানে বেশ ভীড় জমেছে লোকের। সকালের নরম রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে কেউ, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। মণ্ডলও গিয়ে জুটেছে সেখানে।

তাদের আলাপের গুঞ্জন বাড়ীর ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছে। বাড়ীর ভেতরে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন করতে ব্যস্ত অনিরুদ্ধেরা। জিনিষপত্র বাঁধা হচ্ছে।

প্রসাদী দু'টো মাটির হাঁড়ি নিয়ে এসে বলল,—এ দু'টোও নেন।

হাঁড়ির মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে বাঁধা।

বিভাস প্রশ্ন করল,—কি আছে এতে?

—কয়ডা চিঁড়ের মোয়া আর নারকোলের নাড়ু। রাস্তায় খাব্যান আপনিরা।

—তা ভাল, কিন্তু হাঁড়ি দু'টো বয়ে নিয়ে যাবে কে?

—এত নিতি পারেন, আর সামান্য এই দুট্যা হাঁড়ি নিতি পারেন না ?

অপ্রস্তুত হয়ে বিভাস বলল,—পারবনা কেন ? তবে বয়ে নিয়ে যেতে একটু অসুবিধা হবে, তাই বলছিলাম। তা হোক গে,—তুমি দিয়েছ, ও হাঁড়ি দু'টো আমিই বয়ে নিয়ে যাব।

প্রসাদী মুখ টিপে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এমন সময় মণ্ডল বাড়ীর ভেতর এসে বলল,—কি, কতদূর ? গোছ-গাছ হইছে সব ?

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিল বিভাস,—হাঁ, আর দেরি নেই।

অনিরুদ্ধকে তাড়া দিয়ে অজয় বলল,—কিরে, তোর যে এখনও হল না ?

অনিরুদ্ধ বলল,—তোরা এগিয়ে যা। আমি পেছনে আসছি।

একটু পরে নিজের নিজের মোট নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তারা।

বিভাস বলল,—চল মণ্ডল, আমরা হাটি। অনিরুদ্ধ পরে আসছে।

—বেশ, চলেন।

রান্নাঘর থেকে প্রসাদী এসে দাঁড়াল উঠোনে।

বিভাস তাকে বলল,—যাচ্ছি, প্রসাদী।

উত্তরে মৃদুকণ্ঠে প্রসাদী বলল,—কত কষ্ট পায়্যা গেলেন এখানে।

—কষ্ট! কই, আমরা ত বুঝতে পারিনি! কিন্তু আমাদের যাতে কোন কষ্ট না হয়, তার জন্যে তুমি যে কষ্ট স্বীকার করেছ,—তাতে তোমাকে ধন্যবাদ দিলে, তোমাকে ছোটই করা হবে।

প্রসাদী মাথা নীচু করল।

—আচ্ছা চলি।

পা বাড়াল বিভাস। অনিল, অজয় আর মণ্ডল তার অনুসরণ করল।

অনিরুদ্ধ তখনও ঘরের মধ্যে।

প্রসাদী ধীর পায়ে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

অনিরুদ্ধ প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। প্রসাদীকে দেখে সে বলল,—এস। ভাবছিলাম যাবার সময়ও হয়ত দেখা করবে না আমার সঙ্গে। কাল থেকে ত আমাকে এড়িয়েই চলছ।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রসাদী এগিয়ে এল। তারপর অনিরুদ্ধের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, তার পায়ের উপর মাথা নত করল।

বাধা দিল না অনিরুদ্ধ। কারও প্রণাম গ্রহণ করে না অনিরুদ্ধ। কিন্তু প্রসাদীকে আজ সে বাধা দিল না।

প্রণাম করে উঠে প্রসাদী মাথা নীচু করে দাঁড়াল তার সামনে।

অনিরুদ্ধ বলল,—আমি যাচ্ছি বলে, তোমার খুব মন খারাপ হয়েছে প্রসাদী?

প্রসাদী কোন জবাব দিল না।

অনিকদ্ধ ডান হাত দিয়ে প্রসাদীর থুতনি ধরে মুখখানা তুলে ধরল। চোখের জলে সারা মুখখানি তার ভেসে যাচ্ছে। জলভরা দৃষ্টি সে মেলে ধরল অনিরুদ্ধের মুখের পানে।

অনিরুদ্ধ বলল,—আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস।

অনিরুদ্ধের কথা শুনে প্রসাদীর সর্ব-অঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল। দেহটা একটু কেঁপে উঠল। আর কিছুই যে তার গোপন রইল না! লজ্জায় সে অনিরুদ্ধের বুকে মুখ লুকালো।

কিছু পরে অনিরুদ্ধ বলল,—ভালবাসা ত অন্যায় নয়। লজ্জা কি? মুখ তোল।

প্রসাদী চকিতে অনিরুদ্ধের বুক থেকে মাথা তুলে, ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা যে ভাবে ঘটে গেল, অনিরুদ্ধ নিজেও কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। প্রসাদী চলে যাবার পরও অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ

সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিজের মোটটি কাঁধে ফেলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

কোথাও প্রসাদীকে আর দেখা গেল না। আত্মগোপন করেছে সে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করল অনিরুদ্ধ। প্রসাদী এল না। তারপর তাকে উদ্দেশ্য করে অনিরুদ্ধ বলল,—আবার আমি আসব। কলকাতায় গিয়ে জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসব আমি।

প্রসাদী তার ঘরের মধ্যেই ছিল। অনিরুদ্ধের কথাগুলো সব শুনল সে। কিন্তু শত ইচ্ছা থাকলেও, তার সামনে আর বেরোতে পারল না।

অতি আপনজনের মত অনিরুদ্ধদের বিদায় জানাল গ্রামের লোক। সুজানগরের ঘাটে সেদিন সে এক অপূর্ব মেলা। ঘনিষ্ঠ পরিচিত, স্বল্প-পরিচিত আর অপরিচিতের দল, সবাই এসে জড়ো হয়েছে ঘাটে। বৃদ্ধ মজুমদার মশায়ও এসেছেন। কোথায়ও তিনি যান না, কিন্তু অনিরুদ্ধদের বিদায় জানাতে তিনিও এসেছেন।

বিদায়-মুহূর্তে অন্তরঙ্গতার আবেগ পরস্পরকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। অভিভূত হয়ে পড়ল অনিরুদ্ধ আর তার বন্ধুরা। তারা অনুভব করল, গাঁয়ের লোকের অন্তরে তারা কতখানি প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

অনিরুদ্ধ সবাইকে উদ্দেশ্য করে জানাল,—আবার আমি আসব। জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত অবস্থা তাঁকে জানাব। আমার বিশ্বাস, তিনি নিশ্চয়ই কিছু সুবিধা করে দেবেন।

সবার কাছে বিদায় নিয়ে তারা নৌকায় উঠল।

চৌদ্দ

বাড়ীতে ঢুকে অনিরুদ্ধের সাথে প্রথম দেখা হল নকুলেশ্বরবাবুর। নকুলেশ্বরবাবু কমলার পিতা।

নকুলেশ্বরবাবু নীচে বৈঠকখানায় বসে কি যেন পড়ছিলেন। অনিরুদ্ধকে বাড়ী ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে। অনিরুদ্ধও তাকাল। অনিরুদ্ধ কোনদিন নকুলেশ্বরবাবুকে দেখেনি। তাঁর পরিচয়ও সে জানে না। নূতন লোক দেখে কোন কথা না বলে, ওপরে যাবার জন্যে সে অগ্রসর হল।

নকুলেশ্বরবাবু আন্দাজে বুঝলেন, এই বুঝি কমলার ছেলে। তিনি অনিরুদ্ধকে ডাকলেন,—শোন।

ফিরে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ।

তিনি বললেন,—এই এলে বুঝি? তুমিই ত অনিরুদ্ধ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

উঠে পড়লেন নকুলেশ্বরবাবু। বললেন,—তোমার পথ চেয়েই বসে আছি ভাই।

জিজ্ঞাসুনেত্রে অনিরুদ্ধ তাঁর দিকে তাকাল।

তিনি বলতে লাগলেন,—এতবড় বিপদটা গেল; খবর পেয়ে ত ছুটে এলাম। এখন একা বাড়ীতে শোক-তাপা মেয়েটাকে রেখে যাই কি করে? ওদিকে আমার বাড়ীতেও ত দ্বিতীয় পুরুষ-মানুষ কেউ নেই। কি যে হচ্ছে সেখানে, ভগবানই জানেন।

অনিরুদ্ধ বুঝতে পারল সবই। ভদ্রলোকের কথার ধরনে তাঁর ওপর কেমন অশ্রদ্ধা হল অনিরুদ্ধের।

সে জিজ্ঞাসা করল,—বাবা, কবে মারা গেলেন?

—পশু রাত্রে।

—কি হয়েছিল?

—শুনলাম ত, নিমুনিয়া। আগে ত কোন খবর পাইনি।

অনিরুদ্ধ আর কোন কথা না বলে, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে অনিরুদ্ধ চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। প্রতিটি জিনিষ সুবিন্যস্ত। কোথায়ও কিছু অগোছাল নেই। অনিরুদ্ধ ভাবল, নিশ্চয়ই সীতা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে গেছে। না হ'লে তার ঘর এমন করে কে গুছিয়ে রাখবে?

সীতা এসে গেছে ভেবে স্বস্তি অনুভব করল সে।

সীতার বিয়ের চিঠি পেয়ে অনিরুদ্ধের মনে হ'যেছিল, সীতা শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে, বাড়ীতে গিয়ে সে বাস করবে কি করে? সীতার অনুপস্থিতিতে এ বাড়ীতে বাস করা যে অনিরুদ্ধের পক্ষে অসম্ভব। নিজের বাড়ীতে সে পরবাসী। নিজের ঘরখানি ছাড়া সারা বাড়ীতে আর কোথায়ও অনিরুদ্ধের পদক্ষেপ হয় না। খায়ও সে নিজের ঘরে। সীতা ভাত এনে দেয়। খাবার সময় সীতা নিজে বসে তাকে খাওয়ায়। সীতার কলেজে যাবার আগে অনিরুদ্ধ না ফিরলে, অনিরুদ্ধের ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়ে যায় সীতা। সারদাকে বলে দিয়ে যায়, তার খাবার সময় যেন সে খোঁজ নেয়। এই ব্যবস্থাই চলে আসছে।

অনিরুদ্ধের ঘর যেদিকে, কারও সেদিকে আসবার দরকার হয় না। অনিরুদ্ধেরও প্রয়োজন হয় না অন্যদিকে যাবার। তার ঘরের সামনেই যে বাথরুম আছে, অনিরুদ্ধই সেটা ব্যবহার করে।

সমস্ত বাড়ীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর অনিরুদ্ধের কাছে পৌঁছায় না। সীতা তাকে মাঝে মাঝে যতটুকু জানায় ততটুকুই সে জানতে পারে। সৎমাকে অনিরুদ্ধ কোনদিন দেখেনি। দেখবার আগ্রহও নেই, প্রয়োজনও হয়নি।

আস্তে আস্তে চেয়ারটাতে এসে বসল অনিরুদ্ধ। দু'দিনের পথশ্রমে সে ক্লান্ত।

সারদা ঝি এসে বলল,—দাদাবাবু, স্নান করে নিন। ছোটমা বললেন, আপনার হবিষ্যির যোগাড় হয়ে গিয়েছে।

—আচ্ছা, তুমি সীতাকে একবার পাঠিয়ে দাও ত ?

—দিদিমণি ত আসেন নি।

সীতা আসেনি শুনে আশ্চর্য হল অনিরুদ্ধ।

সারদা এ বাড়ীতে ঢুকেছে কমলার বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এ বাড়ীতে সে একেবারে নূতন নয়।

সারদা বলতে লাগল,—কি যে হ'ল, দাদাবাবু! ক'দিন ত মাত্র অসুখ। তার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। ছোটমা একলা, আর আমি। কি করে যে দিনরাত কেটেছে, তা আর কি বলব ? ছোটমার খাওয়া নেই, ঘুম নেই—দিনরাত বাবুর মাথার কাছে বসে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কত ধুমধাম করে দিদিমণির বিয়ে দিলেন, একমাসও গেলনা, এই অঘটন!

চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল সারদা।

অনিরুদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল,—আচ্ছা, আমি স্নান করে নিচ্ছি।

অনিরুদ্ধের কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে, সারদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাথরুমে ঢুকে অনিরুদ্ধ দেখল, ব্রাকেটে সাদা থান আর উত্তরীয় রাখা আছে।

অনিরুদ্ধ বুঝল, ওগুলো ছোটমাই তার জন্যে রেখেছেন। সীতার অনুপস্থিতিতে তার ঘরখানা যে তিনিই গুছিয়ে রেখেছেন, তাতে আর সন্দেহ নেই।

স্নানান্তে শুভ্র থান আর উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে অনিরুদ্ধ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

সারদা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। জানাল, ছোটমা তাকে ডেকেছেন।

—চল।

সারদাকে অনুসরণ করে অনিরুদ্ধ একটি বন্ধ-দরজা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সারদা চেঁচিয়ে বলল,—দাদাবাবু এসেছেন ছোটমা।

ঘরের ভেতর থেকে কমলা বলল,—ভেতরে আসুন। দরজা খোলা আছে।

একটু ইতস্ততঃ করে অনিরুদ্ধ দরজার ওপর চাপ দিল। দরজা খুলে গেল।

কমলা বলল,—আসুন।

ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ। দরজার দিকে পেছন ফিরে ডাল বাঁটছিল কমলা।

সে বলল,—আমার হাত বন্ধ। তাই দরজাটা খুলতে পারলাম না। আমি সব ঠিক করে রেখেছি, আপনি মালসাটা উনুনে চড়িয়ে দিন।

অনিরুদ্ধের দিকে না ফিরে, একই ভাবে বসে কথাগুলো বলল কমলা।

কমলার পেছনে দাঁড়িয়েছিল অনিরুদ্ধ। উনুনটা যেদিকে জ্বলছিল, সেদিকে সে এগিয়ে গেল।

কমলা বলল,—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বসুন। বড্ড বাতাস দিচ্ছে, উনুনটা নিভে যাবে।

কমলার নির্দেশমত দরজাটা ভেজিয়ে দিল অনিরুদ্ধ।

তিনখানা ইট দিয়ে অস্থায়ী উনুন তৈরী করা হয়েছে। উনুনে কাঠ জ্বলছে। আতপ চাল, কাঁচকলা ইত্যাদি উনুনের পাশে গুছিয়ে

রাখা আছে। মাটির মালসাও রয়েছে একটি। অনিরুদ্ধ মালসায় জল দিয়ে চাল, কাঁচকলা ঢেলে নিয়ে উনুনে চড়িয়ে দিল।

কমলা বলল,—এই ডালবাঁটাটুকুও ভাতে দিয়ে দিন।

একটা কাপড়ের ছোট পুঁটুলির মত করে ডালবাঁটা বেঁধে অনিরুদ্ধের দিকে থালাখানা এগিয়ে দিল সে।

তারপর কুশাসন, কলাপাতা পেতে ঠাঁই করে রেখে কমলা বলল,—ভাত হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে পারবেন ত?

এতক্ষণ কমলার সঙ্গে কোন কথা বলেনি অনিরুদ্ধ। কমলা যা যা করতে বলেছে, করে যাচ্ছে। তার দিকে তাকায়ও নি সে।

কমলার প্রশ্নে তার দিকে তাকাল অনিরুদ্ধ। এই প্রথম সে কমলাকে দেখল। আর, দেখে আশ্চর্য হল। সদ্য-বিধবার বেশে একটি কিশোরী মেয়ে। খুবই ছেলেমানুষ। বুঝিবা সীতার চেয়েও ছোট। গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রী। মাথায় স্বল্প ঘোমটা। ঘোমটার পাশে রুক্ষ কুন্তলগুচ্ছ। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন, রিক্ত ও রুক্ষতার মাঝে একটি ফুটন্ত গোলাপ।

অনিরুদ্ধের বুকের মধ্যে গুমরিয়ে উঠল এক অব্যক্ত বেদনায়। কমলার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

অনিরুদ্ধ তার কথার কোন উত্তর দিল না দেখে কমলা বলল,—রান্নাঘরে বাবা আর সারদার রান্না চাপিয়েছি। ওদিকটা দেখে আমি আসছি।

তবুও অনিরুদ্ধ কিছু বলতে পারল না। তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর কমলা ফিরল। ঘরে ঢুকে সে অবাক হয়ে

গেল। উনুনের সামনে অনিরুদ্ধ বসে আছে অথচ উনুনটা যে প্রায় নিভে এসেছে সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। কমলা যে ঘরে ঢুকেছে, তাও সে বুঝতে পারেনি। কি যেন গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন।

কমলা বলল,—আপনার উনুনটা যে নিভে এল?

কমলার কথায় অনিরুদ্ধের চমক ভাঙ্গল। বলল,—তাই ত!

বড্ড লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি উনুনে কাঠ গুঁজে দিতে গেল।

—দাঁড়ান, ভাত বোধহয় হয়ে গেছে। জল ত শুকিয়ে গেছে দেখছি।

উনুনের কাছে এসে ভাল করে লক্ষ্য করে সে বলল,—হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে নিন।

কি করে উনুনের ওপর থেকে গরম মালসা নামাবে অনিরুদ্ধের কাছে সে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

কমলা বুঝতে পারল, অনিরুদ্ধ মালসা নামাতে পারবে না। বলল—আচ্ছা, আপনি সরে আসুন ত।

অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়াল। সরে গেল উনুনের কাছ থেকে।

উনুন থেকে মালসা নামিয়ে কমলা বলল,—হাতটা ধুয়ে আপনি এবার বসে পড়ুন। আমি আপনাকে খেতে দিয়ে যাই।

অনিরুদ্ধ বলল,—আপনার যদি কাজ থাকে, আপনি যান। আমি খেয়ে নেব

—আপনি যে সব ঠিক নিতে পারবেন না, তা আমি জানি। বসুন তো আপনি!

অনিরুদ্ধ আর দ্বিরুক্তি করল না।

সমস্ত মালসার ভাত অনিরুদ্ধের পাতের ওপর ঢেলে দিল কমলা। তারপর ডালবাঁটাসেদ্ধ আর কাঁচকলা সরিয়ে নিয়ে ঘি-নুন দিয়ে মাখতে মাখতে বলল,—সব ভাত একবারে ঢেলে নিতে হয়, দুবারে নিতে নেই।

ভাতে ঘি ঢেলে দিয়ে, কাঁচা দুধ আর পাকা কলা পাতের কাছে ধরে দিয়ে কমলা বলল,—এবার আপনি খেতে থাকুন। বাঁ-হাত দিয়ে খাবার পাতা ছুঁয়ে থাকবেন খাবার সময়। খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই। আমি যাচ্ছি।

অনিরুদ্ধকে খেতে বসিয়ে দিয়ে কমলা চলে গেল।

খেতে বসে খেতে পারল না অনিরুদ্ধ।

পিতার অবিমৃষ্যকারিতায় কমলার জন্যে অনিরুদ্ধের বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে উঠল। এই মেয়েটির সামনে এখন এক বিস্তৃত ধূসর প্রান্তর। সে পথে তার যাত্রা সুরু হল নানা আচার-নিয়ম, বিধি-নিষেধের কঠোরতার ধাপে ধাপে। কি তার সার্থকতা? শুধু মরণের অপেক্ষায় জীবনকে ক্ষয় করে ফেলার দুশ্চর প্রয়াস।

কোনদিন বাল-বিধবার মর্মব্যথা এমন করে আগে উপলব্ধি করেনি অনিরুদ্ধ।

নকুলেশ্বরবাবুকে খাইয়ে, সারদার ভাত বেড়ে রেখে, কমলার রান্নাঘরের পাট মিটতে অনেক বেলা গেল।

হবিষ্যি ঘরে ঢুকে কমলা দেখল, অনিরুদ্ধ একরকম না খেয়েই উঠে গেছে। পাতে সব কিছুই প্রায় পড়ে আছে। দুধটুকুও খায়নি।

ঘরের এঁটো পরিষ্কার করে কমলা নিজের জন্যে মালসা চড়িয়ে দিল।

কমলার খাওয়া হতে হতে বেলা একেবারে গড়িয়ে গেল।

পনেরো

সেদিন আর কোথাও বেরুল না অনিরুদ্ধ। তার শরীর এমনিতেই ক্লান্ত। দুপুরে খেয়ে এসে ঘরে ঢুকে দেখল, মেঝেতে কম্বলের বিছানা পাতা। শুয়ে পড়ল অনিরুদ্ধ।

সন্ধ্যার দিকে সারদা এসে জানাল, ছোটমার বাবা ডাকে ডাকছেন।

ইচ্ছা না থাকলেও, উঠতে হল অনিরুদ্ধকে।

ওপরের বড় ঘরে বসেছিলেন নকুলেশ্বরবাবু। অনিরুদ্ধকে দেখে বললেন,—এস ভাই। আমি এই সাড়ে ছটার গাড়ীতে বাড়ী যাচ্ছি তোমাকে তাই একটু কষ্ট দিলাম।

—কষ্টের কথা কেন বলছেন? প্রয়োজন হলে ডাকবেন বৈ কি।

—তোমার বাবার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। দিনও ত আর নেই। কি ভাবে কি হবে, তারও ত ব্যবস্থা চাই। তুমি ছেলেমানুষ। লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছ,—কিন্তু এ সব ব্যাপারে হয়ত তোমার কোন ধারণা নেই। তাই বলছিলাম—

—ঠিকই বলেছেন আপনি। এ সবের কিছুই আমার জানা নেই। যা করতে হয় আপনিই দয়া করে করুন।

—তা আর তোমাকে বলতে হবে না ভাই। আমি জানি, আমাকেই সব করতে হবে। তবে খরচ পত্র কত কি হবে—এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। আজ আমি যাচ্ছি। পর্শু তোমার দিদিমাকে নিয়ে ফিরব। কাজ-কর্মের বাড়ী, গিন্নী-বান্নী না হলে চলে? কমলি তা আমার ছেলেমানুষ, কিই বা জানে! তোমাদের মাথার ওপর একমাত্র আপনজন আমরা। আমরা না এসে দাঁড়ালে চলবে কেন?

—খরচপত্রের কথা বলছিলেন, তা আমার ঠিক জানা নেই, কত লাগবে ? আপনিই বলে দিন, কত লাগবে ?

—এক কথায় কি কিছু বলা যায় অমনি ? কটা দান করতে চাও, কমলিরই বা কি ইচ্ছে ? নিমন্ত্রিত কত জন ? সব লিখে হিসেব করতে হবে ভাই। তুমি আর কমলি দু'জনে বসে সব ঠিক করে রেখ। পশু´ আমি এসে সেইমত ব্যবস্থা করব। কত খরচ পড়বে—তাও তখন বলে দেব। কমলির মা এসে পড়লে, তোমাদের আর কিছু ভাবতে হবে না। সে একাই একশ। আচ্ছা, দেরি হয়ে যাচ্ছে—আমি উঠি।

উঠে পড়লেন নকুলেশ্বরবাবু। মেয়ের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরোলেন তিনি।

সন্ধ্যার পর ঘরের মেঝেয় কম্বলের বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছিল অনিরুদ্ধ।

সারদা এসে বলল,—ছোটমা আপনাকে খেতে ডাকছেন।

—শরীরটা আমার ভাল নেই। তাঁকে বল, রাত্রে কিছু খাব না।

সারদা চলে গেল।

একটু পরে কমলা নিজেই এসে উপস্থিত হল।

কমলাকে দেখে অনিরুদ্ধ উঠে বসল।

—আপনার শরীর ভাল নেই, শুনলাম। কি হয়েছে আপনার ?

—বিশেষ কিছু নয়। মাথাটা একটু ধরেছে। খাবার ইচ্ছে নেই।

—আপনার চা খাওয়ার অভ্যেস। চা খেতে নেই বলে, দিইনি। কিন্তু চা না খেলে যদি মাথা ধরে, তবে খাওয়াই ভাল। এখন একটু চা করে দেব ?

—চা খেতে নেই নাকি! তবে নাই বা খেলাম।

—পণ্ডিতের বিধানে খেতে নেই। তবে আমি বলি, যা না খেলে, শরীর অসুস্থ হয় তা খাওয়াই ভাল। এতে বোধহয় দোষ নেই। আধুনিক পণ্ডিতেরাও বোধহয় আমার কথায় সায় দেবে।

হেসে ফেলল অনিরুদ্ধ।

বলল,—বেশ দিন তবে এক কাপ।

—দেখুন ত, আপনার চায়ের দরকার ছিল, তবু বলেন নি কেন?

—না, দরকার যে খুব বেশী ছিল তা বুঝতে পারিনি।

কমলাও হেসে ফেলে বলল,—মাথা ধরবার পরও বুঝতে পারেন নি?

হাসতে হাসতে চলে গেল কমলা।

কমলাকে যতই দেখছে, অনিরুদ্ধের অবাক লাগছে। কমলার ব্যবহারে কোন সঙ্কোচ নেই। তার কথায়, হাসিতে—নিজের মনের কোন দুঃখই সে জানতে দিতে চায় না।

এক বাড়ীতে বাস করেও এই মেয়েটির সম্বন্ধে কিছুই জানত না অনিরুদ্ধ। সীতার কাছে তার ছোটমার প্রশংসা সে শুনেছে। কিন্তু এমন ছেলেমানুষ, সরল একটি মেয়ের কল্পনাও সে করেনি তখন।

কমলার ব্যবহারে মনে হয় না যে, মাত্র আজই প্রথম অনিরুদ্ধের সাথে তার আলাপ হল। এক বেলার মধ্যে কমলা সমস্ত সঙ্কোচ, অপরিচয়ের বাধা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনিরুদ্ধের মনে হচ্ছে, সে নিজেই কমলার কাছে যেন সহজ হতে পারছে না।

কমলা নিজেই চা নিয়ে এল।

অনিরুদ্ধের হাতে চায়ের কাপ দিয়ে কমলা বলল,—গরম চা খেয়ে নিন, মাথা ধরা সেরে যাবে।

অনিরুদ্ধ চায়ে চুমুক দিল।

কমলা দাঁড়িয়ে আছে। অনিরুদ্ধ ভাবল, কিছু বলা উচিত। চুপ করে থাকাটা যেন বিশ্রী ঠেকছে।

কমলাকে সে জিজ্ঞাসা করল,—সীতা শুনেছে সব?

—হ্যাঁ। চিঠি দিয়েছি তাকে। ওর স্বামীর সঙ্গে ও এখন বৃন্দাবনে আছে।

—বৃন্দাবন?

—হ্যাঁ, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা।

—ও!

আর বলবার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না অনিরুদ্ধ।

রিং সমেত এক গোছা চাবি বিছানার ওপর রেখে কমলা বলল,

—চাবিগুলো থাকল।

—কিসের চাবি?

—সব চাবিই এর মধ্যে আছে, কোনটা কিসের, বলতে পারব না।

—চাবিগুলো আমাকে দিচ্ছেন কেন?

—তবে কাকে দেব?

—আপনার কাছেই তো আছে, দেবেন আর কাকে?

—ওঁর মৃত্যুর সময় আমি ছাড়া কাছে আর কেউ ছিল না। তাই চাবিগুলোও আমার কাছে রয়ে গেছে। আপনি এসে গেছেন, এখন ওগুলোর দায়িত্ব আপনার।

—ভুল বললেন। আপনি থাকতে, আমি কেউ নই।

—আপনার জিনিষ আপনি বুঝে নেবেন না?

—বাবা নেই, আপনি আছেন;—এর মধ্যে বুঝে নেবার তো কিছু নেই। আর আপনি ত জানেন, বাড়ীতে আমি কদিনই বা থাকি? শ্রাদ্ধ মিটে গেলেই, আমায় আবার চলে যেতে হবে। আপনার বাবা রয়েছেন, তিনিই এখানকার সব দেখা-শোনা করতে পারবেন বললেন।

—বাবা কেন দেখা-শোনা করতে আসবেন? শ্রাদ্ধ মিটে গেলে, এখানকার ব্যাপারে তিনি যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন—এ আমার

ইচ্ছে নয়। তা হতেও দেব না আমি। বাবা পরশু আসবেন বলে গেলেন। শ্রাদ্ধে কত কি খরচ-পত্র হবে, আপনাকে ঠিক করে রাখতে বলেছেন। সিন্ধুকে কত টাকা আছে, জানি না। সিন্ধুকের চাবিও বোধহয় এর মধ্যে আছে। আপনি কাল খুলে দেখবেন।

—কিন্তু কাল সকালেই যে আমাকে একবার বেরোতে হবে।

—ঘুরে এসে করবেন।

—কখন ফিরব তার কি ঠিক আছে? আচ্ছা, ও কাজটা কাল আপনিই করে রাখুন না।

—আমি মুখ্যু মেয়েছেলে। অত হিসেবপত্র বুঝি না। সময় করে কাল আপনিই করবেন।

—এর মধ্যে আবার হিসেবটা কোথায়? যা পাবেন, গুণে ফেলবেন। ব্যস! অবশ্য যদি আপনার অসুবিধে হয়, তবে থাক।

—বেশ, আপনি যখন পারবেন না, আমিই যেমন পারি একটা হিসেব তৈরী করে রাখব। কিন্তু যেখানেই যান, সকাল করে ফিরবেন। এসে আবার আপনাকে নিজেকেই তো মালসা পোড়াতে হবে। মাথাধরা সেরেছে আপনার?

—হ্যাঁ, অনেকটা কম মনে হচ্ছে।

—তবে খেতে চলুন। ওবেলা আপনার খাওয়া হয়নি। সবই তো পাতে পড়ে ছিল। রাত্রে না খেলে, শরীর আরও খারাপ হবে।

—বেশ, সামান্য কিছু দিন তাহলে।

—সামান্যই। ফলমূল আর দুধ। আমি সব ঠিক করে দোর-গোড়ায় সারদাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি আসুন।

কমলা চলে গেল।

খাদ্যের আয়োজন দেখে অনিরুদ্ধ বলল,—এত ফলমিষ্টি তো খেতে পারব না।

কমলা বলল,—আপনি খেতে বসুন তো! কিচ্ছু বেশী দিইনি। চুপ করে খান, খাবার সময় কথা বলতে নেই।

—কিন্তু কিছু তুলে নিন। সত্যিই অত খেতে পারব না।

দু' টুকরো শাঁখ-আলু তুলে নিয়ে কমলা বলল,—নিন, কমিয়ে দিলাম। আর কথা নয়, এবার খেতে সুরু করুন।

কমলার কথার মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে, অনিরুদ্ধ আর আপত্তি করতে পারল না।

দুপুরে অনিরুদ্ধের খাওয়া ভাল হয়নি, তাই কমলা নিজে বসে অনিরুদ্ধকে খাওয়াতে লাগল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই অনিরুদ্ধ দেখল, ধূমায়িত চা নিয়ে কমলা ঘরে ঢুকছে।

—একি, এত সকালেই আপনি চা নিয়ে এসেছেন।

—সকাল আর নেই। রোদ উঠে গেছে। সারদাকে দিয়ে দু'বার খবর নিয়েছি, আপনি ওঠেননি। এবার না উঠলে, আপনাকে ডেকে তুলতে হত। আপনাকে চা না দিয়ে অন্য কাজে হাত দিতে পারছি না।

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে অনিরুদ্ধ বলল,—এত বেলা হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে যে এক্ষুনি বেরোতে হবে!

হাত বাড়িয়ে কমলার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিল অনিরুদ্ধ।

কমলা বলল,—বেশী দেরি করে ফিরবেন না যেন।

—না, না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কমলা।

ষোল

মুলেন স্ট্রীটে থাকেন মহেন্দ্র রায়। মথুরাপুরের জমিদার।

ভবানীপুর থেকে ট্রামে বাসে যেতে হলে, ঘুরপথে যেতে হয়। দেবেন্দ্র ঘোষ রোড থেকে পদ্মপুকুর হয়ে সোজা হেঁটে চলল অনিরুদ্ধ।

সাদা দোতালা বাড়ী। আয়তনেও এমন কিছু বড় নয়। তবে আধুনিক বড়লোকদের বাড়ী যেমন হয়, অনেকটা সেই ধাঁচের। গেট দিয়ে ঢুকেই অনেকটা খোলা জায়গা। বেশ সাজানো-গোছানো ফুল গাছের সারি। ফুলগুলোর বেশীর ভাগই নাম-না-জানা বিদেশী ফুল। এক পাশে টেনিস লন্। লাল পাথরের কুচি-ঢালাই পথের দু'পাশ দিয়ে রংকরা ইট ত্রিভুজাকৃতি করে বসানো। পথটা গেট থেকে সোজা গাড়ী-বারান্দার নীচে পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। গাড়ীর জন্যেই সে পথ। সে পথে হাঁটতে গেলে, আল্‌গা পাথরের কুচিগুলো জুতোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর খালি পায়ে তো বেশ বেঁধে সেগুলো।

নগ্নপদে সেই পথ ধরে গাড়ী-বারান্দার নীচে পর্যন্ত চলে এল অনিরুদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য! গেটে দরওয়ান নেই, এখানেও কেউ কোথায়ও নেই। সামনের যে ঘর, তার দরজাও বন্ধ।

অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কাউকে ডাকবে নাকি! এমন সময় দরজা খুলে একটি সুবেশা তরুণী বেরিয়ে এল। অনিরুদ্ধকে দেখে সে বলল,—আপনি কাকে চান?

—মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—বাবা তো এখনও ওঠেননি।

—এখনও ওঠেননি?

—একটু বেলায় ওঠাই ওঁর অভ্যেস। তাছাড়া, উনি অসুস্থ।

—ওঁর সঙ্গে দেখা করাটা আমার জরুরী। উনি কি খুবই অসুস্থ, দেখা হবে না?

—দেখা করতে হলে, আপনাকে অনেকক্ষণ বসতে হবে।

—তাতে আমার আপত্তি নেই। আজ দেখা না হলে, আবার তো সময় নষ্ট করে আরেকদিন আসতে হবে।

—আপনি কি অনেকদূর থেকে আসছেন?

—না, ভবানীপুর থেকে আসছি।

—আমি বাইরে বেরুচ্ছি। চাকরকে বলে দিচ্ছি, বাবা উঠলে, আপনার কথা বলবে। বাবা কি আপনাকে জানেন?

—না, মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আমি ওঁর কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি।

অনিরুদ্ধের কথা শুনে মেয়েটি কি যেন একটু চিন্তা করল। তারপর তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানি ঝকমকে গাড়ী এসে সেখানে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে একজন স্যুটধারী সুবেশ যুবক নেমে মেয়েটিকে বলল,—এই যে মিস রয়, নীচেই আছেন দেখছি। কি ব্যাপার? ইনি?

মেয়েটি যুবকটির কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখানা দশটাকার নোট বের করে অনিরুদ্ধের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—নিন।

অনিরুদ্ধ মৃদু হেসে বলল,—আমার যা ভিক্ষে, মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকেই চেয়ে নেব।

—এর বেশী বাবার কাছ থেকে আশা করবেন না। অনর্থক ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না।

যুবকটি বলে উঠল,—যত সব ন্যুসেন্স!

নোটখানা অনিরুদ্ধের সামনে ফেলে দিয়ে, মেয়েটি হন্ হন্ করে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

যুবকটি অনিরুদ্ধের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেয়েটির পেছনে পেছনে গিয়ে গাড়ীতে বসল।

গাড়ী করে তারা চলে গেল।

অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল অনিরুদ্ধ।

কিছুক্ষণ পর একজন চাকর ভেতর থেকে এদিকে আসতে, অনিরুদ্ধ তাকে জিজ্ঞাসা করল,—মহেন্দ্রবাবু উঠেছেন ?

—না, এখনও ওঠেননি।

—তিনি উঠলে বলবে, অনিরুদ্ধ চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—কি নাম বললেন ?

—অনিরুদ্ধ চৌধুরী।

—আচ্ছা, ভেতরে গিয়ে বসুন। বাবু উঠলে, আমি বলব।

মাটি থেকে নোটখানা তুলে নিয়ে অনিরুদ্ধ ঘরের ভেতরে গিয়ে একটি সোফায় বসল।

মেয়েটি মিথ্যে বলেনি। ঘণ্টা-খানেকেরও বেশী অপেক্ষা করবার পর অনিরুদ্ধের ডাক পড়ল।

চাকরটি এসে জানাল,—বাবু আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

চাকরটির পেছন পেছন অনিরুদ্ধ ওপরে উঠে গিয়ে দাঁড়াল মহেন্দ্রবাবুর সামনে।

মহেন্দ্রবাবু ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

অনিরুদ্ধ হাত-জোড় করে বলল,—নমস্কার।

—নমস্কার। বসুন।

খবরের কাগজখানা নামিয়ে রাখলেন মহেন্দ্রবাবু।

বয়স যতটা না হ'ক, মহেন্দ্রবাবুর দেহে বার্ধক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনিরুদ্ধের মনে হল, ভদ্রলোক যেন অকালে বুড়িয়ে গেছেন। মনে যে তাঁর শান্তি নেই, তাঁর মুখ দেখলেই তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

—আপনার বাবা মারা গেলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার সম্বন্ধে অনেক খবরই আপনি রাখেন দেখছি।

—কাল ননীর চিঠি পেয়েছি। আপনার বাবার অসুখের খবর পেয়ে আপনি কলকাতা রওয়ানা হয়েছেন, তার চিঠিতেই সে খবর জেনেছি। আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তাও জানতাম। ননীই আমাকে সে সম্বন্ধে লিখেছে।

—নায়েব মশায় আমার সম্বন্ধে অনেক খবরই আপনাকে দিয়েছেন, কিন্তু মথুরাপুরের লোকের দুর্গতির কথা হয়ত সব আপনাকে জানান নি। সেটা আপনাকে জানাতেই এসেছি।

—আপনার সন্থ পিতৃ-বিয়োগ ঘটেছে। এসব আলোচনা ক'দিন পরে করলেও তো চলত!

—না, মহেন্দ্রবাবু। তাদের অবস্থা এত শোচনীয় যে, আমার ব্যক্তিগত শোকদুঃখ সে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তাদের আমি আশা দিয়ে এসেছি। আপনার প্রজাদের দুরবস্থার কথা সব জানলে, আপনি নিশ্চয়ই তাদের দয়া করবেন। আপনাকে তারা দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করে। শুধু নায়েব মশায়ের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনি বহুদিন গ্রাম ছেড়েছেন। গ্রামের অবস্থা যে কত খারাপ হয়ে গিয়েছে, বলে আপনাকে আমি তা বোঝাতে পারব না। তারপর আছে নায়েব মশায়ের নিরঙ্কুশ অত্যাচার। নানাভাবে টাকা আদায় করেন তিনি,—তার ওয়াশীল থাকে না জমিদারী খাতায়। বিচারের আশায় কার কাছে যাবে তারা? প্রতিকারহীন এই অত্যাচার দিনে দিনে তাদের ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তারপর এবারের এই বন্যায় তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছে। অর্ধাহারে, অনাহারে তাদের দিন কাটছে। দুর্ভিক্ষ করালমূর্তিতে এগিয়ে আসছে। খাজনা তারা কি করে দেবে? এবারের খাজনা আপনি মাপ করে দিন মহেন্দ্রবাবু।

—আমি তো ননীকে লিখে দিয়েছি, যে যেমন পারে, দেবে।

—তা জানি, কিন্তু নায়েব মশায় জোর করছেন খাজনা হালসন শোধ করে দিতে হবে। দিতে না পারলে, তাঁর অত্যাচার বাড়বে বই কমবে না। তারপর আছে তাঁর নিজের পাওনা-গণ্ডা। আপনি নায়েব মশায়কে লিখে দিন, এবার খাজনার জন্যে তিনি যেন কাউকে কিছু না বলেন। সামনের সনে তারা সবাই খাজনা দেবে। সকলে হয়ত দু'সন একসঙ্গে দিতে পারবে না, তাদের মাপ করে দিতে হবে আপনাকে।

—বেশ, ননীকে আমি তাই লিখে দেব। কিন্তু জানেন তো, গভর্ণমেণ্ট জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে। আমাদেরও তো তখন অনাহারে থাকতে হবে অনিরুদ্ধবাবু!

—আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন, বৃহত্তর প্রয়োজনে ছোট স্বার্থ বিসর্জন তো দিতেই হবে।

—আপনি কিন্তু একতরফা রায় দিলেন।

—আমি সত্যি কথা বলেছি মাত্র। জনাকতক লোক কোন পরিশ্রম না করে, অন্যের পরিশ্রম-লব্ধ উপার্জনের মোটা অংশ ভোগ করবে,—চিরদিন এ অন্যায় তো চলতে পারে না।

—জগতটাই তো এইভাবে চলছে।

—কিন্তু আর চলতে চাইছে না, চলা উচিৎ নয় বলে।

—গভর্ণমেণ্ট কি জমিদারী প্রথা লোপ করে, প্রজাদের নিষ্কর বাস করতে দেবে বলে মনে করেন?

—না, তা দেবে না। তবে ঐ খাজনার টাকায় প্রজাদেরই সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে।

—জমিদারও তাই করত। আপনি হয়ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবেন, জমিদাররা বিলাস-ব্যসনে টাকা খরচ করে। হ্যাঁ, তা কিছুটা হয় বটে! তবে সেটা সাধারণ নিয়ম। গভর্ণমেণ্টের মোটা মাইনের অফিসাররাও জমিদারের চাইতে কোন অংশে কিছু খাটো হতে চাইবেন না। সব কিছুই হবে, সবই থাকবে, তবে প্রজার অদৃষ্টের

লিখন খণ্ডাবে না। বরঞ্চ গভর্ণমেন্টের কড়া আইনের আওতায় দয়া-মায়ার কথাই উঠবে না। সবাই বলবে—আইন।

—শুধু খারাপ দিকটাই আপনি দেখেছেন।

—খারাপ দিকটাই ভাবা আগে উচিত। জানেন তো রাম-রাজত্বেও ভিখিরী ছিল। গরীব চিরদিন ছিল, থাকবেও। তাদের দুঃখকষ্টেরও রদ-বদল হবে না, ব্যবস্থা যতই বদলাক। ইতিহাস আমাদের বলে যে, ভাল-মন্দ কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হয় না। জমিদারী প্রথার লোপ হয় ত তেমনি একটা পরিবর্তন।

—পরিবর্তন যে জগতের রীতি—এ সত্য। কিন্তু প্রজার ভাগ্য সম্বন্ধে আপনার দর্শনকে আমি মেনে নিতে পারলাম না মহেন্দ্রবাবু। পরে যদি সুযোগ পাই, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। আজ উঠি।

তারপর দশটাকার নোটখানা বের করে অনিরুদ্ধ বলল,—প্রথমে এখানে এসে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমার এই বেশ দেখে, আর আমি আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি জানতে পেরে, এই দশটি টাকা উনি আমায় দান করেছেন।

—ছিঃ ছিঃ এ কি করেছে রুমি! আমার মেয়ের ব্যবহারে আমি বড্ড লজ্জিত অনিরুদ্ধবাবু। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি রুমিকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

—উনি বেরিয়ে গেছেন। আর, আমি মনেও কিছু করিনি। আমি ভিক্ষুক তো নিশ্চয়ই, তবে নিজের জন্যে ভিক্ষে করিনে। ভবিষ্যতে ওঁর কাছে হাত পাতলে, উনি বিমুখ করবেন না জেনে গেলাম।

নোটখানা মহেন্দ্রবাবুর সামনে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে উঠে পড়ল অনিরুদ্ধ। বলল,—আর বিরক্ত করব না আপনাকে। নমস্কার।

—নমস্কার।

যুক্তকর কপালে ঠেকালেন মহেন্দ্রবাবু।

সতের

অনিরুদ্ধ চলে যাবার কিছু পরেই মহেন্দ্রবাবুর কন্যা রমা ও পূর্বোক্ত যুবক নব্য-ব্যারিষ্টার মিঃ কনক চৌধুরী ফিরে এল।

মহেন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকে রমা বলল,—আজ কেমন আছ বাবা?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন,—সকাল বেলাতেই কোথায় বেরিয়েছিলি?

—বা! তোমাকে তো কালই বলেছিলাম, আমার কয়েকটা জিনিষ কিনতে হবে।

—তার এত তাড়া কিসের! এখনও তো অনেক সময় রয়েছে।

—কি যে বল তুমি বাবা! মাত্র তো বারোদিন হাতে আছে। কত কি যে দরকার পড়বে, এখন থেকে মার্কেটিং না করলে ভুলে যাব।

মিঃ চৌধুরী বলল,—মেয়েদের ব্যাপার তো! হাতে একটু সময় থাকতেই করে ফেলা ভাল।

—হুঁ।

মহেন্দ্রবাবু আর কিছু বললেন না। টেবিলের ওপর রক্ষিত এইমাত্র পড়া খবরের কাগজখানা তুলে চোখ বুলোতে লাগলেন।

মিঃ চৌধুরী বলল,—কাল চিঠি এসে গেছে কাকাবাবু। বি. এন. আর হোটেলেই দু'টো স্যুইট রিজার্ভড হয়েছে। যাক্ এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আপনাকে খবরটা জানাতে সকালেই চলে এলাম।

—হোটেলে না থেকে, একটা ছোট বাসা নিলেই তো চলত।

—না, সেসব মহা হাঙ্গামা। আর ভাল বাসাই আজকাল পুরীতে মেলা দুষ্কর। সব ভ্যাষ্টি। সি-সাইড আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল

বলছে ডাক্তার, না হলে আমি তো দার্জিলিং যেতেই বলতাম আপনাকে। পয়সা ফেললে, সেখানে কোন অসুবিধাই নেই।

কথা-বার্তার মাঝে রমা একসময়ে উঠে গিয়েছিল। কয়েকটা বড় কাগজের প্যাকেট হাতে নিয়ে সে পুনরায় ফিরে এল।

—দেখতো বাবা, কাপড় ক'খানা কেমন হল ?

প্যাকেট থেকে একখানা শাড়ী বের করে মহেন্দ্রবাবুর সামনে ধরল রমা।

—বেশ হয়েছে। কিন্তু কাপড়ের তোমার কি দরকার পড়ল এখন ?

—বা! নূতন জায়গায় যাচ্ছি, দু'একখানা নিউ ডিজাইনের নেব না সঙ্গে ?

—সবই তো তোমার নিউ ডিজাইনের।

—রোজ দু'বেলা ডিজাইন বদলাচ্ছে, আর তুমি বলছ—সবই আমার নিউ ডিজাইনের ?

—কি জানি, তা হবে!

—আমি কিন্তু একখানা শাল কিনেছি বাবা। শাল কেনবার আমার অবশ্য তত ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মিঃ চৌধুরীর পছন্দ হয়ে গেল শালখানা।

মিঃ চৌধুরী বলে উঠল,—স্পেলেনডিড্! অপূর্ব! অদ্ভুত মানাবে আপনাকে। লাল সেডের শালখানা গায়ে জড়িয়ে আপনি যখন সি-শোরে হেঁটে বেড়াবেন, সবাই চেয়ে থাকবে। সে অপূর্ব দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্যে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবে তারা।

মিঃ চৌধুরীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন,—এটা কি শাল গায়ে দেবার সময় ?

—শাল ব্যবহার করা প্রাচ্য আভিজাত্যের প্রতীক। তাই শাল ব্যবহার করবার নির্দিষ্ট কোন কাল আছে বলে আমি মনে করি না, কাকাবাবু।

—তুমিও কি রুমির সঙ্গে মার্কেটিংএ গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। মানে, আমি যখন এলাম, উনি বেরোচ্ছিলেন। তাই ওঁকে একটু সাহায্য করতে আমিও গেলাম সঙ্গে।

তারপর হাতঘড়ি দেখে মিঃ চৌধুরী বলে উঠল,—উঃ! এগারোটা বেজে গেছে! আমি তাহলে এবার উঠি কাকাবাবু। কোর্টে একটা জরুরী কেস রয়েছে।

—আচ্ছা, এস।

মিঃ চৌধুরী চলে গেল।

মহেন্দ্রবাবু রমাকে বললেন,—সকালে এক ভদ্রলোককে তুমি দশটি টাকা দান করেছিলে। টাকাটা ঐ তিনি রেখে গেছেন।

টেবিলের ওপর নোটখানা তখনও পড়েছিল।

—সে কি! লোকটা তোমার কাছেও এসেছিল তাহলে?

—যিনি তোমার দশটাকা দান গ্রহণ না করে, ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে একটু সম্ভ্রম করে তোমার কথা বলা উচিত নয় কি? বুঝতে পারছ, তিনি ভিখিরী নন।

—তাই তো সে,—ভদ্রলোকটি বললেন।

মহেন্দ্রবাবু একটু হেসে বললেন,—আমার সঙ্গেই তিনি দেখা করতে এসেছিলেন। ননী যে অনিরুদ্ধ চৌধুরীর কথা লিখেছিল, উনিই সেই অনিরুদ্ধ চৌধুরী। ননী আমাকে অনেক মিথ্যা কথাই লিখেছে, বুঝতে পারলাম।

—উনি তো আমাদের শত্রু। ওঁকে অত সম্মান করে কথা বলছ কেন বাবা?

—উনি আমাদের কোন শত্রুতা করেন নি। কতকগুলো দুঃস্থ লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেছেন। তাই ননী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঁকে শত্রু মনে করেছে।

—কিন্তু ওঁরা তো কমিউনিষ্ট, মিঃ চৌধুরী বলেন।

—কমিউনিষ্ট কিনা জানিনে, কিন্তু লোকের দুঃখে প্রাণ না কাঁদলে

সত্য পিতৃশোক ভুলে, তোর কাছে অপমানিত হয়েও অন্যের জন্যে আবেদন নিয়ে তিনি আসতে পারতেন না। ছেলেটির অন্তঃকরণ বড় মহৎ। তোর কাছে অপমানিত হয়েও তোর প্রশংসা করে গেলেন। তুই যে দান করতে পারিস, সেটাই তিনি মনে রাখলেন। মান-অপমানের ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ।

রমা আস্তে আস্তে মহেন্দ্রবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিঃ কনক চৌধুরী মহেন্দ্রবাবুর মৃত বন্ধুর পুত্র। মিঃ চৌধুরী কিছুদিন হল বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরেছে। বিলেতে থাকতেই তার পিতৃবিয়োগ ঘটে! মিঃ চৌধুরী হাইকোর্টে যাতায়াত করে বটে তবে ব্রীফ্ পায় না। তাতে অবশ্য তার ভাবনার কিছু নেই। তার পিতৃধনের পরিমান নেহাৎ অল্প নয়। তবে সে যে ব্রীফ্-লেস ব্যারিষ্টার সেটা প্রকাশে নিশ্চয়ই লজ্জা আছে, তাই সুযোগ পেলেই সে তার জরুরী কেসের অজুহাতে সরে পড়ে।

কনক চৌধুরী বিলেতে থাকতেই তার পিতা আর মহেন্দ্রবাবুর মধ্যে রমার সাথে কনকের বিয়ের কথা আলোচনা হয়। কনক ফিরে এলে বিয়ে হবে, তাও স্থির হয়ে যায়। রমার মত কনকও ছেলেবেলায় মা হারিয়েছে।

দুই বন্ধুর মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, রমা ও কনকের মধ্যে কোন পরিচয় ছিল না। দুই বন্ধুরই গৃহিনীহীন সংসার, তাই তাদের ছেলে-মেয়েদের পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল না, পরিচয়ও ছিল না।

কনক বিলেতে বসে তার পিতার পত্রে জানতে পারে যে, মহেন্দ্র-বাবুর মেয়ে রমার সঙ্গে তিনি তার বিবাহ স্থির করেছেন। পিতা হয়ত পুত্রকে হুঁসিয়ার করে দেবার জন্যেই খবরটা আগে জানিয়ে রেখেছিলেন।

বিলেত থেকে ফেরবার পর রমার সঙ্গে কনক চৌধুরীর পরিচয় হয়। মহেন্দ্রবাবুই তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। কনক যেমন জানত, রমাও জেনেছিল যে, কনকের সাথে তার বিয়ে হবে। তবে বি এ. পরীক্ষার আগে সে বিয়ে করবে না, মহেন্দ্রবাবুকে জানিয়েছিল রমা। কনকেরও তাতে আপত্তি ছিল না। রমা থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। প্রথম পরিচয়েব পর থেকে, ক্রমে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। পরস্প'রের মেলামেশায় মহেন্দ্রবাবু কোন বাধা দেননি। মা-হারা মেয়ে রমাকে মহেন্দ্রবাবু একটু বেশী আদর দিয়েছেন। তাই রমার চাল-চলন, কথা-বার্তায় একটু বেশী-স্বাধীনতার ছাপ। খরচও করে রমা বেহিসেবী চালে।

মহেন্দ্রবাবু বুঝতে পারেন, রমাকে তিনি বেশী আদর দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আর উপায় নেই' রমার জন্যে অনেক সময় তিনি নিজেই কুণ্ঠিত বোধ করেন।

আঠার

অনিরুদ্ধ বাড়ী ফিরতেই কমলার কাছ থেকে তাগিদ এল তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেবাঁর।

অনিরুদ্ধ দেখছিল পৈতৃক-সম্পত্তির কাগজপত্র। কমলা সেগুলো তার টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে কমলার হাতে লেখা একখানা হিসেবের কাগজও ছিল।

দেখা গেল, বাড়ীতে নগদ রয়েছে শ' দুয়েক টাকা মাত্র। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে হাজার পঞ্চাশেক টাকা। এ ছাড়া চা-বাগানের শেয়ার আছে হাজার কয়েক টাকার। কালীঘাটে তাদের যে আরেকখানা বাড়ী রয়েছে, তা থেকে মাসে আড়াইশ' টাকা ভাড়া পাওয়া যায়।

অনিরুদ্ধ ভাবল, বাবা এত টাকা জমিয়েছেন! অনিরুদ্ধের হাতে পড়ে এ টাকা নষ্ট হ'ক, তিনি নিশ্চয়ই চাননি। অনিরুদ্ধ তার বাবার মন জানত। সীতার মুখেই একদিন অনিরুদ্ধ শুনেছিল, বাবা নাকি অনিরুদ্ধকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, দান-খয়রাত করে অনিরুদ্ধ সব টাকা উড়িয়ে দেবে। তাই তিনি উইল করে যাবেন, যাতে অনিরুদ্ধের হাতে পড়ে টাকাগুলো নষ্ট না হয়।

উইলখানা খুঁজছিল অনিরুদ্ধ। উইলের কথা অনিরুদ্ধ অবিশ্বাস করেনি। কেননা, অবিনাশবাবুর পক্ষে সেইটাই করা সম্ভব।

না, উইল পাওয়া গেল না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কমলা এল অনিরুদ্ধের ঘরে।

অনিরুদ্ধ বলল,—আমি তো সব দেখলাম। ঘরে রয়েছে মাত্র দু'শো টাকা। ব্যাঙ্কের টাকা বোধ হয় এখন তোলা যাবে না।

—কিন্তু দু'শো টাকায় কি হবে?

—আজ বিকেলে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাব। সে আইনজ্ঞ। ব্যাঙ্কের টাকা তোলা যাবে কিনা, কতদিন দেরি হবে—সে বলতে পারবে।

—বাবা তো কাল আসবেন। যদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এখন না তোলা যায়, তবে?

—ধার করতে হবে।

সারদা এসে খবর দিল, সীতা দিদিমণি এসেছেন।

কমলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সীতার সঙ্গে সিঁড়ির মুখেই দেখা হল। দু'জনের প্রথম সাক্ষাতে কেউই কোন কথা বলতে পারল না। শুধু সীতার চোখ দু'টো জলে ভরে উঠল।

কমলা তার হাত ধরে বলল,—আয়। জামাই আসেনি?

—নীচের ঘরে বসে আছে।

—ছিঃ ছিঃ, সে কি! আমি যাই জামাইকে ডেকে নিয়ে আসি। তুই তোর দাদার ঘরে যা।

—দাদা এসেছে?

—হ্যাঁরে।

কমলা নীচে নেমে গেল। সীতা তার দাদার ঘরের দিকে গেল।

সীতাকে দেখে অনিরুদ্ধ বলল,—আয়। একলা এলি নাকি?

দাদার প্রশ্নে সীতা একটু লজ্জা পেল। বলল,—না। ছোটমা ওকে নিয়ে আসছে।

—বস তুই। কোথা থেকে আসছিস এখন?

—আজ সকালে বৃন্দাবন থেকে ফিরেছি। এখন আসছি শ্বশুর বাড়ী থেকে।

—কোথায় তোর শ্বশুরবাড়ী?

—শ্যামবাজারে।

কমলা প্রবীরকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

প্রবীর অনিরুদ্ধকে প্রণাম করতে নত হতেই, তাকে বাধা দিয়ে অনিরুদ্ধ বলল,—থাক ভাই। বস তুমি ঐ চেয়ারে।

কমলা কলল,—তোমরা গল্প কর, আমি আসছি।

সীতাও উঠে ছোটমার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অনিরুদ্ধ বলল,—তোমরা আজই ফিরেছ শুনলাম।

—হ্যাঁ। বৃন্দাবনে থাকতে চিঠি পেলাম। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে চিঠিটা পেলাম। আর একটা দিন থেকে, সীতার 'চতুর্থী' ওখানেই সেরে ফেললাম। না হলে, আর সময় ছিল না।

—তা ভালই করেছ। সীতার বিয়ের সময় আমি আসতে পারিনি। সবে কাল ফিরেছি।

—হ্যাঁ, আমি শুনেছি। উত্তরবঙ্গে আপনি 'রিলিফ' করতে গিয়েছিলেন।

—'রিলিফ' তাদের বিশেষ কিছু করতে পারিনি। আজ সেখানকার জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি এ বৎসরের খাজনা মাপ করতে রাজী হয়েছেন।

—জমিদার বুঝি এখানেই থাকেন?

—হ্যাঁ। তোমাদের জমিদারীটি কোথায়?

—মেদিনীপুরে। তবে জমিদারের চাইতে বাবাকে শিল্পপতি বললেই এখন ঠিক বলা হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বেলঘরিয়াতে বাবা দু'টো কাপড়ের মিল করেছেন। বেশ ভালই চলছে মিল দু'টো।

—মিল কি তুমি নিজে দেখা-শোনা কর?

—না, বাবা দেখেন।

প্রবীরের সঙ্গে এমনি টুকি-টাকি আলাপ করতে লাগল অনিরুদ্ধ।

কমলা জামায়ের জন্যে জলখাবারের আয়োজন করতে ব্যস্ত।

সীতা বলল,—তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ছোটমা? এই কি জামাই আদর করবার সময়?

—বা! তাই বলে জামাইকে জল খেতে দিতে হবে না?

সীতা আর কিছু বলল না।

'জল-খাবার' সাজিয়ে কমলা সারদাকে বলল,—দাদাবাবুকে গিয়ে বল, জামাইকে নিয়ে এখানে আসতে।

জলখাবারের আয়োজন দেখে প্রবীর বলল,—একি, এখন এত সব খাবার! এই তো কিছুক্ষণ আগে খেয়ে বেরিয়েছি।

কমলা বলল,—সে তো অনেকক্ষণ। সীতার কাছে শুনেছি।

প্রবীর বলল,—এখানে আসবে সেই তাড়ায় সীতার হয়ত ভাল করে খাওয়া হয়নি। তাই ওর খিদে পেয়েছে।

প্রবীরের কথা শুনে সীতা রাগ করে কমলাকে বলল,—বা! তাই আমি তোমাকে বলেছি নাকি ছোটমা?

—না, না, প্রবীর তোকে রাগাচ্ছে। তুমি বসত' প্রবীর।

—এত আমি সত্যিই খেতে পারব না।

—আচ্ছা বসত' গল্পে গল্পে খেয়ে নাও।

—আপনি বিশ্বাস করুন ছোটমা, আমার এখন খাবার দরকার নেই। আপনি বলছেন,—তাই না হয় বসছি। সীতা জানে, আমি এত খেতে পারিনে।

—আমি কিচ্ছু জানিনে। বাব্বা! আপ উঠিয়ে, আপ উঠিয়ে করে যে লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সীতার কথায় সবাই হেসে উঠল।

কমলা বলল,—হল তো? নাও এবার বসে পড়। যা পার খাও।

প্রবীর আর কোন কথা না বলে বসে পড়ল।

উনিশ

সীতাকে রেখে গেছে প্রবীর। সীতার শাশুড়ী নিজেই সীতাকে ক'দিন এখানে থেকে যেতে বলেছেন।

মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সীতার শ্বশুর-শাশুড়ী এসেছিলেন। সময়মত কমলা তাঁদের খবর দিতে পারেনি। খবর দেবার মত লোক ছিলনা বাড়ীতে। মৃত্যুর পরদিন তাঁরা খবর পেয়েছিলেন। খবর পেয়েই তাঁরা এসেছিলেন। নকুলেশ্বর বাবু তখন এসে গেছেন। অবিনাশ

বাবুর যখন বাড়াবাড়ি অসুখ, নকুলেশ্বর বাবুকে আসতে চিঠি দিয়েছিল কমলা। নকুলেশ্বর বাবুও চিঠি পেয়ে এসে পৌঁছলেন মৃত্যুর পরদিন সকালে। পাড়ার ছেলেরা তখন শবদাহ করে শ্মশান থেকে ফিরছে।

সন্ধ্যার পর অনিরুদ্ধ ফিরল তার উকিল বন্ধুর বাড়ী থেকে।

সীতা আর কমলা তখন গল্প করছিল। কথা হচ্ছিল, অবিনাশ বাবুর মৃত্যুর ঠিক পূর্বেকার ঘটনা নিয়ে। অসুখে পড়ে অবিনাশবাবু যে একেবারে অন্য-মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন—সেই কথাই কমলা বলছিল সীতাকে। সীতাকে তিনি যে খুব স্নেহ করতেন, সীতা না জানলেও কমলা জেনেছিল। সীতার সম্বন্ধে তিনি যে ক'টি কথা বলেছিলেন, কমলা জানাল সীতাকে। শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলল সীতা। কমলার চোখও শুষ্ক ছিলনা। কমলা বার বার বলতে লাগল—অবিনাশবাবুর মৃত্যুর জন্যে সে নিজেই দায়ী! ভদ্রলোক ছিলেন একটু স্নেহ-মমতার প্রত্যাশী। বাইরেটা তাঁর ছিল রূঢ় আবরণে ঢাকা। তাঁকে বুঝতে না পেরে তাঁর মনে ব্যথা দিয়েছে কমলা।

শুনতে শুনতে আশ্চর্য হয়ে গেল সীতা। কমলাকে বিয়ে করে কমলার জীবনটা তিনি ব্যর্থ করে দিয়ে গেলেন—সে জন্যে আজ আর কমলার কোন অভিযোগ নেই। কমলার মন আজ অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। অবিনাশবাবুর প্রতি সে যে স্ত্রীর কর্তব্য করেনি,—এই জন্যেই তার অনুশোচনা।

আজ এক নূতনরূপে কমলাকে দেখল সীতা। আজ সে আদর্শ হিন্দুনারীর প্রতিচ্ছবি। কমলার কথা শুনে, তার অন্তরের পরিচয় পেয়ে সীতা অভিভূত হয়ে পড়ল।

দু'জনেই কেঁদে সারা হল।

অনিরুদ্ধ ফিরতে, চোখ-মুছে তার ঘরে এসে উপস্থিত হল তারা।

অনিরুদ্ধ বলল,—খবর বিশেষ আশাপ্রদ নয়। খুব তাড়াতাড়ি করলেও চার পাঁচদিনের আগে কিছু করা সম্ভব নয়। এখন টাকা ধার করা ছাড়া উপায় নেই।

কমলা সীতাকে বলল,—সীতা তুই বস। আমি খাবার ব্যবস্থা দেখি গে, যাই।

চলে গেল কমলা।

অনিরুদ্ধ বলল,—পড়া-শোনা ছেড়ে দিলি তুই ?

—শ্বশুর-শাশুড়ী মেয়েদের বেশী পড়া-শোনা পছন্দ করেন না।

—তোর স্বামী কি বলে ?

—বলেছে, বাবা-মার মত যাতে হয় চেষ্টা করবে। তাঁদের আপত্তি না থাকলে, কলেজে যেতে সুরু করব।

—তারপর কোথায় কোথায় ঘুরলি, বল ?

—দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, মথুরা আর বৃন্দাবন। আরও ঘুরবার ইচ্ছা ছিল। বৃন্দাবনে ছোটমার আর শ্বশুর মশায়ের চিঠি পেয়ে ফিরে এলাম।

—ঐ যা! ভদ্রলোকের নামটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নি ?

—কার নাম ?

—তোর স্বামীর।

—তুমি হাসালে দাদা। ভগ্নীপতির নামটাও জান না ?

— সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে। নামটা জেনে নেওয়া উচিৎ ছিল।

—এতক্ষণ তবে তোমরা আলাপ করলে কি করে ?

—আলাপ করতে তো নামের দরকার হয়নি।

—বেশ যা হোক তুমি! ওর নাম—প্রবীর ভূষণ লাহিড়ী। বিদ্বে এম. এ. বি. এল। তবে ওকালতী করেনা। বাবার পয়সায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে আর সঙ্গীত-সাধনা করে। ভালো সরোদ-শিল্পী ও। কলকাতার রেডিও গ্রামোফোনে নাম তো আছেই—বাইরেও সুনাম আছে।

—বা! চমৎকার ছেলে। প্রবীরকে দেখেই আমার ভাল লেগেছে রে। তারপর সে তো একজন গুণী শিল্পী।

অনিরুদ্ধ যে এতদিন তার স্বামীর নামটা জানতেও আগ্রহ বোধ

করেনি এতে সীতা আহত হয়েছে। তার স্বামী সম্বন্ধে অনিরুদ্ধের এই ঔদাসীন্যে মনের কোনে একটু অভিমানও জমা হল সীতার। অনিরুদ্ধের সাংসারিক অল্প-বুদ্ধির কথা সীতা জানে, তবুও আজ সে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারলনা।

অনিরুদ্ধ বুঝতে পেরেছে সীতার অভিমান। তাই তাকে খুসী করবার জন্যে আবার বলল,—এবার একদিন প্রবীরের সরোদ-বাজনা শুনতে হবে। এতবড় শিল্পী আমার ভগ্নীপতি—এ তো আমার গর্বের কথা।

প্রবীরের প্রশংসায় সীতা খুসী হল।

বলল,—কিন্তু বিনয়ের অবতার। কেউ প্রশংসা করলে বলে, কি আর শিখেছি। সারা জীবন ধরে শিখলেও যে শিক্ষার শেষ নেই।

—ঠিকই বলেছে প্রবীর। সে গুণী বলেই এ কথা বলতে পেরেছে।

—আচ্ছা, আচ্ছা অনেক হয়েছে। এবার তোমার খবর বল দাদা?

মথুরাপুরের খবর সংক্ষেপে সীতাকে বলল অনিরুদ্ধ। তারপর আজ সকালে মহেন্দ্রবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের গল্পটাও বলল।

শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল সীতা।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কমলা বলল,—অত হাসছিস কেনরে সীতা?

—সে এক মজার গল্প ছোটমা। দাদাকে চিনতে না পেরে জমিদার-নন্দিনী দাদাকে ভিখিরী মনে করে দশটাকার একখানা নোট দান করেছে।

—কে জমিদার-নন্দিনী?

—মথুরাপুরের জমিদার-নন্দিনী। দাদা আজ সকালে জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—তারপর ?

—তারপর আর কি,—দশটাকার নোটখানা দাদার দিকে ছুড়ে দিয়ে গট্ গট্ করে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

—আচ্ছা দেমাক তো ?

—তাই দেখনা !

কমলা অনিরুদ্ধকে বলল,—আপনি খেতে চলুন।

—দাদাকে 'আপনি' বলা কিন্তু তোমার মোটেই শোভা পায়না ছোটমা। বাইরের কেউ শুনলেই বা কি মনে করবে ?

সীতার কথায় কমলা কোন উত্তর দিলনা। মুখটা নীচু করল।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অনিরুদ্ধ বলল,—প্রবীর যে একজন উঁচুদরের শিল্পী সে কথা তো আপনি বলেননি আমায় ?

—আমাকে কি কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন,—করেছ ? আর প্রবীরের সম্বন্ধে আমি কতটুকুই বা জানি ? প্রবীরকে আবিষ্কার করবার দায় তো এখন সীতার। ওর মুখেই তো আমরা শুনব।

—ছোট মা !

সীতা রেগে যাচ্ছে দেখে কমলা বলল,—আমি খুসী হয়েছি যে প্রবীর আমাদের মান রেখেছে। বিয়ের আগে সীতা যেরকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, প্রবীরের কোন আশাই ছিলনা।

—ভাল হচ্ছেনা কিন্তু ছোটমা। প্রবীর কেন কোন বীরকেই আমি বিয়ে করতে চাইনি।

—বিয়ে করে এখন ঠকেছিস নাকি ?

কমলার কথার উত্তর না দিয়ে পূর্বেকার কথার জের টেনে সীতা বলল,—দাদা ভাবল, আমার বিয়ে করতে না চাওয়ার বুঝি অন্য কারণ আছে। এদিকে বাবা যা অশান্তি আরম্ভ করলেন, শেষে ছোটমা, তুমিও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে। দেখলাম, আমার জন্যেই যখন এত অশান্তি, বিয়েতে মত দিয়ে অশান্তির শেষ করাই ভাল।

—তা ভাই, আমাদের শান্তি দিতে গিয়ে ভালই করেছিস। এখন

তো আর আমাদের ওপর অভিমান নেই? এখন সব চল, রাত হয়েছে।

অনিরুদ্ধের সামনেই সীতাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করল কমলা। এ ভাবেই কথা বলতে তারা অভ্যস্ত। তাদের পরস্পরের আলাপ শুনে অনিরুদ্ধ হাসল।

—চল দাদা?

—হ্যাঁ, চল।

কুড়ি

পরদিন সকালে এলেন নকুলেশ্বরবাবু। নকুলেশ্বরবাবুর স্ত্রী আসেননি। নকুলেশ্বরবাবু বললেন,—তার শরীরটা ভাল নেই তাই এলনা।

কমলা জানে, এ কথা সত্য নয়। মা তার মেয়ের এই বিধবার বেশ সহ্য করতে পারবেন না বলেই আসেন নি। মাকে তো কমলা জানে! হয়ত তিনি কেঁদেই আকুল হচ্ছেন। কমলার বিয়ের সময়ও কেঁদেছিলেন তিনি। কেঁদেছিলেন মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে তার জন্যে যতটা নয়—মেয়েকে মনের মত পাত্রে বিয়ে দিয়ে পারেননি বলেই তাঁর দুঃখ হয়েছিল বেশী।

নকুলেশ্বরবাবু এসেই ঘোষণা করলেন,—তিনি সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে, বিষয়-সম্পত্তির সুরাহা করে দিয়ে তিনি যাবেন।

কমলার ভাল লাগলনা পিতার এই অতি হিতৈষীর আতিশয্য। নকুলেশ্বরবাবু গরীব, তাতে কমলার দুঃখ নেই—কিন্তু তাঁর মনটাও যে গরীব হয়ে গেছে! জামায়ের মৃত্যুর পর যে কদিন তিনি কমলার কাছে ছিলেন, অনবরত কমলাকে উপদেশ দিয়েছেন কি করে বিষয়

সম্পত্তি হাত করতে হবে। সৎছেলেকে যে বিশ্বাস নেই, একথা বার বার তাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন নকুলেশ্বরবাবু। অবিনাশ-বাবুর অসুখের সময় আগে থাকতে তাঁকে খবর পাঠায়নি বলে, কমলার নিবুর্দ্ধিতায় তিনি দোষারোপ করেছেন। কমলার মত বোকা মেয়ে যে এতদিনে বাড়ী-ঘর টাকা-পয়সা কিছুই লিখিয়ে নিতে পারেনি—এ তো জানা কথা। সময়মত তিনি এসে পড়লে, একটা উইল তিনি নিশ্চয়ই করিয়ে নিতে পারতেন।

পিতার এবংবিধ মনস্তাপে কমলা নিরুত্তর, নির্বিকার থেকেছে। সিন্ধুকের চাবি যখন তিনি কমলার কাছে চেয়ে বসলেন, কমলা জানাল, তার কাছে চাবি নেই। কোথায়ও না কোথায়ও আছে, পরে খুঁজে দেখবে।

কমলাকে বলে বলে না পেরে শেষে নিজেই তিনি চাবি খুঁজতে কসুর করেননি। কিন্তু যে চাবি পাছে নকুলেশ্বরবাবুর হাতে পড়বে ভয়ে কমলা নিজের বাক্সে বন্ধ করে রেখেছিল, নকুলেশ্বরবাবু তা পাবেন কি করে?

ঘৃণা হয়ে গেছে কমলার পিতার মনের পরিচয় পেয়ে। তিনি, গরীব, তাই উপযুক্ত পাত্রে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেননি, এতদিন এইটাই ছিল কমলার সান্ত্বনা। জামায়ের মৃত্যুর পর নকুলেশ্বর-বাবুর স্বার্থবুদ্ধি আর চাপা থাকেনি। কমলার ভবিষ্যতের জন্যে যত না হক, অর্থের জন্যে তাঁর লোলুপতা বুঝতে পেরেছে কমলা।

মেয়ের ঔদাসীন্যে মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন নকুলেশ্বরবাবু। সৎছেলে এসে পড়লে আর কি কিছু সুবিধা হবে?

তবুও হাল ছাড়েননি তিনি। সংসার-অনভিজ্ঞ অনিরুদ্ধের অভিভাবক সেজে বসলেন, কারোও অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই।

বৃষোৎসর্গ, ষোড়শদানের ফর্দ দিলেন নকুলেশ্বরবাবু।

অনিরুদ্ধ জানতে চাইল, কত খরচ পড়বে?

খরচের কথায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তিনি। পিতৃ-শ্রাদ্ধ

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই যে উপযুক্ত পুত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া অবিনাশবাবু যখন কোন অভাব রেখে যাননি, ব্যয়সঙ্কোচ করে কাজের অঙ্গহানি করা উচিত নয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনিরুদ্ধ অপ্রস্তুত হয়ে বলল,—খরচ কমাতে হবে, তাতো বলিনি। কত খরচ পড়বে তাই জানতে চেয়েছি।

—এই তো উপযুক্ত পুত্রের কথা। তা ধর না গিয়ে, দান-সামগ্রীতে পাঁচ সাত শ' টাকা আর লোক খাওয়ানোর খরচ। কত লোক খাওয়াবে?

অনিরুদ্ধ সীতাকে বলল,—সীতা, কতজনকে নিমন্ত্রণ করতে হবে একটা ফর্দ করে দে। আমি একটু ঘুরে আসছি।

—এত বেলায় আবার কোথায় যাচ্ছ দাদা?

—বেশী দেরি হবেনা, আমি এখখুনি আসব।

নকুলেশ্বরবাবু বললেন,—তা যাও, তুমি তাড়াতাড়ি ঘুরে এস। আজকের মধ্যেই সব লিষ্ট তৈরী করে, কেনা-কাটা সুরু করতে হবে। সময় তো আব নেই। আমাকেই তো করতে হবে সব।

চলে গেল অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধের ফিরতে বেশ দেরি হল। নকুলেশ্বরবাবু তখন আহারান্তে দিবা-নিদ্রা দিচ্ছেন।

অত দেরি করে ফিরল বলে, কমলা আর সীতা অনুযোগ করল। অনিরুদ্ধকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই তাকে স্নান করতে পাঠাল কমলা।

তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে অনিরুদ্ধের ঘরে এল কমলা।

অনিরুদ্ধকে সে জিজ্ঞাসা করল,—যার জন্যে এত দেরি করে ফিরলে, তার কোন ব্যবস্থা হল?

—হ্যাঁ। ওবেলা টাকাটা পাব। শ' বারো টাকা যোগাড় হল।

—বাবা যা যা বলেছেন, সবই কি অবশ্য করণীয় ?

—উনি তো তাই বলছেন।

—বাবার মুখের ওপর আমি কিছু বলতে পারিনি। টাকা ধার করে অত দানসামগ্রী কি করা উচিত ? বৃষোৎসর্গ, ষোলদান না করে সংক্ষেপেও তো করা যায়।

—এ সব তো আমি ভাল বুঝিনা, ওঁর ইচ্ছেমত কাজ না করলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন।

—বেশ, আমি আর কিছু বলবনা। তবে সুদ দিয়ে টাকা ধার করতে হবেনা। আমার কয়েকখানা গয়না বিক্রী করে টাকা নিয়ে এস।

রুমালে বাঁধা গহনার পুটুলি অনিরুদ্ধের সামনে রাখল কমলা।

—একি ! তা কি করে হয় ?

—তাই ভাল হবে। ধার করা চলবে না।

কমলা আর অপেক্ষা না করে চলে গেল।

অনিরুদ্ধ বলল,—বুঝলাম না তো সীতা ! উনি কি রাগ করলেন ?

—তাই মনে হল ।

—আমি কি অন্যায়' কিছু বললাম নাকি ?

—না, তবে ছোটমা তার বাবাকে পছন্দ করে না, বুঝতে পেরেছি। ছোটমা আমাদের ভালই চায়।

—তবে কি করব বলত ?

—বিকেলে বলব। তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর দাদা, আমি যাই।

অনিরুদ্ধের ঘর থেকে বেরিয়ে কমলার খোঁজে তার ঘরে ঢুকল সীতা।

আগা-গোড়া চাদরে ঢেকে শুয়ে ছিল কমলা।

সীতা এসে বসল তার পাশে।

—তুমি রাগ করেছ ছোটমা?

—কেন রে, রাগ করব কেন।

—দাদা বলছিল, দাদার ওপর তুমি রাগ করেছ।

—আমাকে সবাই ভুল বোঝে। আমার কপালই এই রকম।

—তুমি গয়না বিক্রী করছ কেন?

—গয়না দিয়ে আমার কি হবে, বলত তুই। আমার কোন প্রয়োজনেই লাগবে না, অথচ ওগুলো বিক্রী করে এ খরচটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এসব কথা থাক। তুই তোর শ্বশুর বাড়ীর গল্প কর, শুনি।

একুশ

শ্রাদ্ধ মিটে গেছে। নকুলেশ্বরবাবু চলে গেছেন। সীতা তখনও শ্বশুরবাড়ী ফিরে যায়নি।

নকুলেশ্বরবাবু শেষ পর্যন্ত মেয়ের ওপর বিরূপ মন নিয়েই গেছেন। নকুলেশ্বরবাবুর ফর্দমত সব কাজ হয়নি। কেননা, অনিরুদ্ধ পাঁচশ'র বেশী টাকা দিতে পারেনি।

ধার না করে গহনা বিক্রী করে, শ্রাদ্ধের খরচ চালাতে বলেছিল কমলা। গহনা বিক্রী করতে অনিরুদ্ধ কিছুতেই রাজী হয়নি। শেষে কমলার কথামত অনিরুদ্ধ পাঁচ শ' টাকা ধার করেছিল। গহনা বিক্রীর কথা অবশ্য নকুলেশ্বরবাবু জানেন না, কিন্তু কমলাই যে অনিরুদ্ধকে পাঁচশ'র বেশী টাকা ধার করতে দেয়নি—বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। মেয়ের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। শ্রাদ্ধের পরদিনই তিনি চলে গেছেন। এখানে আর একটা দিনও থাকবার আগ্রহ প্রকাশ করেননি তিনি।

সীতা আর অনিরুদ্ধের মধ্যে কথা হচ্ছিল,—কমলা সম্বন্ধে। কমলা তখন সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল।

অনিরুদ্ধ বলল,—তুইই বলত, ওঁর সমস্ত জীবনটা কি এইভাবেই কাটবে?

—তাইতো, দুঃখ হয় দাদা।

—এই অল্পবয়েস—! আমার তো মনে হয়, ওঁকে আবার বিয়ে দেওয়া উচিৎ।

—ছিঃ, দাদা!

—কেন রে? কোন সৎপাত্রে ওঁকে যদি আমরা বিয়ে দিই, সে তো খারাপ নয়। আর তাছাড়া ওঁর জীবনটা এইভাবে নষ্ট হবে, তাই কি ভাল হবে?

—তাহলে নিন্দেয় কান পাতা যাবে না দাদা। আমার শশুর-বাড়ীতেই বা সবাই কি মনে করবে!

—ওঃ!

—আর, তাছাড়া ছোটমাকে তুমি জাননা। বাবার মৃত্যুর জন্যে ছোটমা নিজেকেই দায়ী করছে। আবার বিয়ে করার কথা ছোটমা ভাবতেও পারে না। আগে ছোটমাকে যা জানতাম, এখন সে একেবারে বদলে গেছে।

—এখনই যে বিয়ে দিতে হবে, এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে রকম যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয়—আমি খুসীই হব সীতা।

—ছোটমার কোনদিনই সে রকম ইচ্ছে হবে না।

—সময়ে সব বদলায় সীতা। মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছে, অনিচ্ছেও বদলায় বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার তাগিদে। মনের মাঝে এই যে, অদল-বদলের খেলা চলে—তার বেশীর ভাগই আমরা চেপে রাখি পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে, সাহসের অভাবে।

—কিন্তু ছোটমা যদি আবার বিয়ে করে, আমি আশ্চর্যই হব দাদা।

সীতার কথার উত্তর না দিয়ে অনিরুদ্ধ বলল,—আমি ভাবছি, কালীঘাটের বাড়ীখানা, আর কিছু টাকা ওঁর নামে আলাদা করে দেব! আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে উনি কেন বিপদে পড়বেন।

—সে তোমার যা ইচ্ছে কর।

—দিদিমণি, ছোটমা ডাকছেন।

সীতাকে ডেকে গেল সারদা। সীতা চলে গেল।

অনিরুদ্ধ হাসল। বিয়ের পর সীতা বদলে গেছে। ছোটমাকে ধনদৌলত দিতে চাইলে, সীতা অখুসী নয়। ছোটমাকে সে নিশ্চয়ই ভালবাসে। তবে তাকে আবার বিয়ে দেবার কথায় সীতার মন সায় দেয় না। ছোটমা আজ শুধু তার বন্ধু নয়, তার স্বামীর শাশুড়ী।

বাইশ

ক'দিন হল সীতাও চলে গেছে শ্বশুরবাড়ীতে। অনিরুদ্ধ তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, বাড়ীতে প্রায়ই থাকে না। প্রথম কয়েকটা দিন কমলার ফাঁকা ফাঁকা লাগল। এখন সয়ে গেছে। আর মনে হয় না। আগেও তো এমনি একা একা কয়েকদিন কাটিয়েছে—সীতার বিয়ের পর।

রান্নাঘরের কাজ সে সেরে যতটা সময় পায়, ঘর-দোর গোছায়। কিন্তু তারপরেও সময় থাকে। তাই কোনদিন বা সেলাই নিয়ে বসে সে। তাও যখন আর ভাল লাগে না, চুপ করে বসে থাকে।

একদিন বাইরে থেকে ফিরতে অনিরুদ্ধের খুব দেরি হয়ে গেল। প্রায় বেলা তিনটে। অনিরুদ্ধ জানে, তার খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত কমলা খায় না। এর আগেও এ নিয়ে সে কমলাকে বহুবার বলেছে যে, তার ফিরতে দেরি হলে কমলা যেন খেয়ে নেয়। কিন্তু কোন ফল হয় নি।

আজ খেতে বসে আবার অনিরুদ্ধ বলল,—দেখুন তো, আমার

জন্যে আপনি এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকেন, এ আমার ভাল লাগেনা। আপনি বাড়ীতে অনাহারে রয়েছেন ভেবে মনে স্বস্তি পাইনা, অথচ কাজ ফেলে আসতেও পারা যায় না।

—দেরিতে খেলে মেয়েদের কিছু হয় না। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে তোমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে কাজ করবে কি করে?

—ওটা অভ্যেসের ওপর নির্ভর করে। দেরি করে খাওয়া আমার নূতন নয়। অনেক সময় তো এমন হয় যে সারাদিন কিছুই খাওয়া হল না। আপনার তো এসব অভ্যেস নেই, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বার কথা আপনারই।

—আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে, ক্ষতি নেই, আমি তো নিষ্কর্মা। যারা কাজ করে, সময় পায় না। আর সময় আমার ফুরুতে চায় না।

—সত্যিই তো, আপনিও তো কাজ করতে পারেন।

—কি কাজ?

—সবচেয়ে যা বড় কাজ, মানুষকে জ্ঞান বিতরণ।

—ও হরি! আমি কি জানি যে, অন্যকে শেখাব?

সে কথার জবাব না দিয়ে অনিরুদ্ধ বলল,—জানেন, মানুষের সবচেয়ে বড় পাপ কি? মূর্খতা। মূর্খতা থেকে আসে কুসংস্কার, হীনতা আর দারিদ্র্য। যে দেশের বিরাট জনসংখ্যার প্রায় সবটাই মূর্খ, সেখানে বন্যায় দু' আঁটি খড় আর দুর্ভিক্ষে দু'মুঠো চাল ছিটিয়ে সত্যিকারের কোন কাজ হয় না।

—কিন্তু সবাই তো লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায় না?

—যাতে সেই সুযোগ পায়, আমাদের আগে তাই করা উচিৎ। দেশের মূর্খতা নাশ না করতে পারলে, কোন ভাল কাজই স্থায়ী হতে পারেনা। তাতে সুফলও হয়না।

কমলা বলল,—আমি বিয়ের আগে স্কুলে পড়তাম। ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে আমার বিয়ে হয়ে গেল। আবার আমার পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্কুলে আর ভর্তি হতে পারব না।

—বেশ তো, বাড়ীতেই আপনি পড়ুন। আমার একজন প্রফেসার বন্ধুকে বলব, সে রোজ এসে আপনাকে পড়াবে।

—বাইরের কোন লোকের কাছে আমি পড়তে পারব না।

—পড়া-শোনায় কি লজ্জা করা উচিৎ !

—সে তুমি বুঝবেনা। তুমি যদি সময় করে একটু-আধটু দেখিয়ে দাও তো হয়।

—আমি ? আমাকে তো প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতে হয়।

—তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

—বেশ, যতটা সময় পাই আপনাকে সাহায্য করব। তারপর আপনি এমনি অন্যকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে যখন প্রস্তুত হবেন, সত্যিই সেদিন আপনার দ্বারা দেশের কাজ অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

অনিরুদ্ধের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠে পড়ল সে।

তেইশ

পথের দিকে চেয়ে দিন গোনে প্রসাদী। যাবার সময় রাঙ্গা-দাদাবাবু বলে গেছে, আবার আসবে। তার আসার প্রতীক্ষা করে প্রসাদী প্রতিদিন। একটি করে দিন যায়, প্রসাদী ভাবে কাল হয়ত আসবে।

অনিরুদ্ধের পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেছে সবাই। এখান থেকে যাবার ক'দিন পরে মজুমদার মশাইকে চিঠি দিয়েছিল অনিরুদ্ধ। সেই চিঠিতে এ দুঃসংবাদের কথা সে জানিয়েছিল। জমিদার খাজনা যে মাপ করে দিয়েছেন, খ্যতঃ সেই খবর জানাতেই চিঠি দিয়েছিল অনিরুদ্ধ। শেষ ছত্রে তার পিতার মৃত্যু-সংবাদ ছিল।

মজুমদার মশাইকে সবাইকে সে চিঠি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার দু'দিন পর জমিদারের কাছ থেকেও নায়েব মশাই চিঠি পায়। জমিদারের চিঠিতে কি লেখা ছিল, তা কেউ জানতে পারেনি। তবে 'নাড়ি মশাই' খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আর কড়াকড়ি

করছেনা দেখে, সবাই বুঝল জমিদারের নির্দেশ। অনিরুদ্ধকে সবাই শ্রদ্ধা জানাল। মনে মনে তো বটেই, মুখেও যে অনেকে প্রকাশ না করল, তা নয়।

তারপর দিনের পর দিন কেটে যায়। অনিরুদ্ধের আর কোন খবর আসেনা। কত্তাদার সঙ্গে প্রসাদীর প্রায়ই অনিরুদ্ধের সম্বন্ধে কথা হয়। নাতনীর তাগিদে কয়েকবার ঈশান মণ্ডল মজুমদার মশায়ের কাছেও গিয়েছিল, যদি কোন খবর এসে থাকে।

খবর না পেয়ে পেয়ে প্রসাদী কত্তাদার কাছে আর জানতে চায় না। কিন্তু সব কাজের মধ্যেও তার খবর জানবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে সে। প্রসাদীর মন বুঝতে পারে কেদারের মা। 'রাইএর মন উচাটন'—বলে ঠাট্টাও সে করে। ভৎর্সনা করে প্রসাদীকে,—উপদেশ দেয়, আবার দুঃখী মেয়েটার কথা ভেবে নিজেও দুঃখিত হয়।

কেদারের মায়ের সব কথাতেই মৃদু হাসে প্রসাদী। স্বীকার করতে চায় না যে, তার কোন ভাবান্তর হয়েছে। বিকেলে শুধু লক্ষ্মীর গলকম্বলে হাত বুলোতে বুলোতে মনের কথা কয় তার সঙ্গে। বলে,—রাঙ্গাদাদাবাবু আমাদের ভুলে গেছে না রে লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মীও যেন উপলব্ধি করে প্রসাদীর অন্তর্দাহন। ঘাড় নেড়ে, শব্দ করে সে সমবেদনা জানায়।

একদিন হাট থেকে ফিরে মণ্ডল বলল,—শুনিছিস দিদি, কলকাতায় নাকি দাঙ্গা লাগিছে ?

— দাঙ্গা ?

—হয়, হেঁদু-মোছলমানের দাঙ্গা।

—কন থিক্যা শুনল্যা তুমি ?

—কাগজে লিখিছে। হাটে শুনল্যাম।

—রাঙ্গাদাদাবাবুর খবর পাও নাই কিছু ?

বৃদ্ধ হঠাৎ এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল,—তার কথা জানব কি কর‍্যা। সে কি আমাদের কথা আর মনে রাখিছে ?

—ও কথা কও ক্যান? বাপের শোক পাইছে। হয়ত ঝঞ্ঝাটে আছে, তাই চিঠি-পত্তর দিতে দেরি হতিছে।

—লোকে কয়, বড়লোকের ছাওয়াল—কয়দিন হাউস মিটায়ে গিছে।

—তাদের জন্যি যে এত করল, লোকে তো তাকে মন্দ কবিই এ্যাখন। লোকের কথায় কান দেও ক্যান? নিজির মন বুঝ্যা কথা কও।

প্রসাদীর অভিমানও অনিরুদ্ধের ওপর কম নয়! কিন্তু অন্য কেউ তাকে মন্দ বলবে, এ তার অসহ্য।

ক'দিন পর, সত্যিই অনিরুদ্ধের খবর পাওয়া গেল।

মজুমদার মশাইকে চিঠি লিখেছে সে। কলকাতার দাঙ্গার উল্লেখ করে বলেছে, হঠাৎ এরকম একটা গোলমাল সৃষ্টি হওয়ায়, তাদের বহু কাজ বেড়েছে। আপাততঃ সে এখন কলকাতার বাইরে যেতে পারবেনা। চিঠিতে গাঁয়ের প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করেছে।

দাঙ্গার ব্যপারে মথুরাপুরে যেন কোন উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়, মজুমদার মশাইকে সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছে।

বাড়ী এসে মণ্ডল প্রসাদীকে জানাল, অনিরুদ্ধের চিঠির কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রসাদী জিজ্ঞাসা করল, আর কি লিখেছে। প্রসাদীর নামোল্লেখও নেই চিঠিতে, কিন্তু তাতে প্রসাদী মোটেই ক্ষুণ্ণ হল না। লোকে এবার বুঝুক, রাঙ্গাদাদাবাবু তাদের ভোলেনি।

দাঙ্গার খবর রোজই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কলকাতা থেকে মফস্বলেও সংক্রামিত হল এই মারামারির জের।

রোজই নূতন নূতন ঘটনা শোনা যেতে লাগল। কলকাতার পরেই, নোয়াখালিতে সুরু হল। এরপর আরও নানা জায়গায়।

ভীত হয়ে পড়ল মথুরাপুরের লোক। কবে যেন তাদের মধ্যেও হানাহানি সুরু হয়ে যায়। গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সভা করে তাদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখবার শপথ গ্রহণ করল।

মজুমদার মশাই, আলিজান মোল্লা, ফাজিল শেখ, ঈশান মণ্ডল, নায়েব ননী লাহিড়ী সবাই একমত। শান্তি যেন নষ্ট না হয়। গাঁয়ের জোয়ানরা যেন ভুল না করে। নানা উপদেশ, নানা শাস্ত্র-বাক্য আলোচিত হল সভাতে।

তবুও ভয় যেন বাসা বেঁধে থাকল সারা গ্রাম খানিতে। ভয় হিন্দুর মনে, ভয় মুসলমানের মনে। কেউই চায় না অশান্তি—তবুও ভয়। চিনে ফেলেছে তারা—দাঙ্গা বাধায় কারা? স্বার্থান্বেষীর দল কখন কিভাবে সুযোগ গ্রহণ করবে—শুধু সেই ভয়। নিজেরা না চাইলেও দাঙ্গা বেধে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাই ভয়।

চব্বিশ

কলকাতার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। শান্তি মিছিল বের হল। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে শান্তি মিছিলে সবাই যোগ দিল। ব্যাপকভাবে হত্যালীলা থামল বটে, তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরল না। রোজই কিছু কিছু গুপ্ত-ছুরিকাঘাতের সংবাদ পাওয়া যেতে লাগল। হিন্দু বা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় পরস্পরের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় রক্ষীদল, সাইরেণ, শঙ্খধ্বনি—সব মিলিয়ে একটা আতঙ্ক অবস্থা। বিশেষ কাজ না থাকলে, বাড়ী থেকে কেউ বেরোয় না। তাও নির্বিঘ্ন এলাকার ভেতর দিয়ে যাতায়াত। ভুলেও অন্যপথে পা বাড়ায় না কেউ। সন্ধ্যার পর তো রাস্তাঘাট ফাঁকা। স্কুল-কলেজ বন্ধ। অফিস, কাছারিও না চলার মত চলতে লাগল।

বিকেল বেলা অনিরুদ্ধ রসা রোড ধরে বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ ফুটপাতে ঘেষে তার পাশে একখানি ঝকঝকে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ীর ভেতর থেকে মেয়েলি-কণ্ঠে তার নাম ধরে কে ডাকল।

অনিরুদ্ধ বিস্মিত হয়ে দেখল, গাড়ীর ভেতর বসে আছে মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে রমা।

—অনিরুদ্ধ বাবু ?

—নমস্কার। আপনি তো আমাকে ভোলেননি দেখছি।

—না, ভুলিনি। হেঁটে কোথায় চলেছেন ?

—ট্রাম-বাস বন্ধ, তাই হাঁটা ছাড়া উপায় কি ? বাড়ী যাচ্ছি।

—উঠে আসুন আপনি।

—না, ধন্যবাদ।

—আসুন, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

—আচ্ছা, তবে চলুন।

গাড়িতে উঠে বসল অনিরুদ্ধ।

—আপনার বাড়ীর নম্বরটা ড্রাইভারকে বলে দিন।

—দেবেন্দ্র ঘোষ রোডে চল। এবার আপনার কথা বলুন।

—সেদিন না জেনে যে অপরাধ করেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।

—না, না, আপনি তো কোন অপরাধ করেননি। আমার বেশভূষা দেখলে, ভিখিরী ছাড়া আর কিছু তো ভাবা যায় না।

—আপনি আমায় ক্ষমা করেননি বুঝতে পারছি।

—আপনি কোন দোষ করেননি, তাই ক্ষমার কথা ওঠেনা। আপনার মনে যদি কোন 'কিন্তু' থাকে—বেশ তবে ক্ষমা করলাম। এই আপনার কথা ?

—হ্যাঁ।

—এইবার তবে আমি নেমে যাই।

—কেন ? চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

—কোথায় গিয়েছিলেন আপনি ?

—তালতলায়, আমার এক বন্ধুর বাড়ী।

—সে তো বিপজ্জনক এলাকা। আপনার একলা যাওয়া ঠিক হয়নি।

—অনেকদিন আমার বন্ধুর কোন খবর পাইনি। তাদের বাড়ীতে টেলিফোনও নেই। তা এত করে গিয়েও তাদের দেখা পেলাম না।

—কেন ?

—সে বাড়ীতে এখন কেউ নেই। দেখলাম, পোড়োবাড়ীর মত পড়ে আছে বাড়ীটা। বাড়ীর সমস্ত দরজা জানালা খোলা।

—হয়ত কোথায় চলে গেছেন তাঁরা। ওদিকটা তো বেশ গোলমাল হয়েছে।

—তারা যে কোথাও চলে গেছে, তাই বা নিশ্চিত করে কি করে বলি! হয়ত তারা কেউ বেঁচে নেই। এ যে কি আরম্ভ হয়েছে! সভ্যজগতে আমরা বাস করছি বলে তে মনে হয় না।

—আপনার বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা আর তাদের পরিচয় যদি আমাকে দেন, হয়ত' সঠিক খবর এনে দিতে পারব।

—তা যদি করতে পারেন, আমি বিশেষ উপকৃত হব অনিরুদ্ধবাবু।

—ড্রাইভার, বাঁয়ে গাড়ী রাখ। আসুন, এই আমার বাড়ী।

—বাড়ীতো চিনে গেলাম, অন্য এক দিন আসব।

—বাড়ীর দরজা থেকে ফিরে যাবেন ?

—আচ্ছা, চলুন।

গাড়ী থেকে নেমে রমা অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাড়ীর ভেতর ঢুকল।

নিজের ঘরে রমাকে বসিয়ে, অনিরুদ্ধ বলল,—আসছি, এক মিনিট!

ঘর থেকে বেরিয়ে সারদাকে দেখতে পেয়ে অনিরুদ্ধ বলল—ছোট-মাকে বল, একটী মেয়ে বেড়াতে এসেছে। আমার ঘরে বসেছে।

রমা অনিরুদ্ধের ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল।

ঘরে ঢুকে অনিরুদ্ধ বলল,—কি দেখছেন ?

—আপনার ঘর। কমিউনিষ্ট হলে কি ঘরে একখানা ছবিও রাখতে নেই ?

হো হো করে হেসে উঠল অনিরুদ্ধ।

—হাসছেন যে!

—আমি কমিউনিষ্ট, এ খবর কোথায় সংগ্রহ করলেন ?

—কেন, এ তো সবাই জানে।

—কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি নিজেই জানিনা। আর ঘরে ছবি টাঙ্গানোর কথা মনেই হয়নি, তাই ছবি নেই আমার ঘরে। অন্য কোন কারণ নেই এর মধ্যে।

—আপনি তবে কমউনিষ্ট নন ?

—বারবার আপনার মুখে এ কথা শুনে মনে হচ্ছে, কমিউনিষ্টকে আপনি ভয় করেন।

—আমি ভয় করতে যাব কেন ? তবে কমিউনিষ্টকে পছন্দ করেনা অনেকেই।

—এদেশে অনেক দল,—যেমন ধর্মে তেমনি রাজনীতিতে। একদল অন্যকে আক্রমণ বা নিন্দা করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু প্রকৃত কর্মী যে, ভিন্ন-দলকে সে কি নিন্দা করে ? প্রকৃত ধার্মিকও অন্যধর্মকে আক্রমণ করে না। কর্মে ও ধর্মে কোন পার্থক্য নেই। সব ধর্মের লক্ষ্য যেমন ঈশ্বর প্রাপ্তি, এ দেশের রাজনৈতিক সমস্ত দলের আপাততঃ লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভ। অথচ দলগত স্বার্থে চরম লক্ষ্য থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ি। দলগত স্বার্থই বড় হয়ে ওঠে।

—আপনার কোন পার্টি, স্পষ্ট করে কই বললেন না তো ?

—কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নই আমি। দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের সেবা করবার ব্রত নিয়েছি আমরা।

একটি রেকাবিতে কিছু ফল-মিষ্টি নিয়ে কমলা ঢুকল ঘরে। টেবিলের উপর সেগুলো রেখে সে বলল,—একটু মিষ্টি মুখ করুন।

—বা ! এসব কেন ?

—কারো বাড়ীতে এলে, একটু মিষ্টি মুখ করতে হয়।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয়ই তো হল না।

অনিরুদ্ধ বলল,—ইনি মা। আর ইনি মিস্ রায়। মথুরাপুরের জমিদার মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে।

—আমি রমা।

কমলাকে নমস্কার করল রমা। কমলাও প্রতি-নমস্কার করে বলল,—নিন, একটু মুখে দিন।

কমলার অনুরোধে রমা একটা সন্দেশ ভেঙ্গে মুখে দিল।

অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল,—মথুরাপুরের কোন খবর জানেন? সেখানে কোন গোলমাল হয়নি তো?

—এখনও হয়নি। নায়েব মশায়ের চিঠি এসেছে।

—আপনার বাবা কেমন আছেন?

—বাবাকে নিয়েই তো মুস্কিল হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, সমুদ্রের ধারে বাবার চেঞ্জে যাওয়া দরকার। কিন্তু যাওয়া আর হল কই? পুরী যাওয়ার সব ঠিক হয়েছিল। আবার বাবার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল, তাই যাবার দিন পিছিয়ে দিতে হল। তারপর তো দাঙ্গা লেগে গেল। বাবা এখন আর কোথায়ও যেতে চান না।

—তোমরা গল্প কর। আমি আসছি।

বলে কমলা চলে গেল।

অনিরুদ্ধ বলল,—আপনার বাবাকে একদিন দেখতে যাব। আগেই যাওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু এই দাঙ্গার ব্যাপারে মন এত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

—আমার বন্ধুর খবরটা নেবেন।

—আপনি সব লিখে দিন। দু' একদিনের মধ্যে আপনাকে খবর দিয়ে আসব।

এই বলে একখানি লিখবার প্যাড রমার দিকে এগিয়ে দিল অনিরুদ্ধ।

কাগজে ঠিকানা লিখে দিয়ে রমা উঠে পড়ল। বলল,—যাই এবার।

অনিরুদ্ধ তাকে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

রোজ রাত্রে অনিরুদ্ধর কাছে পড়া দেখিয়ে নেয় কমলা। সেদিন

রাত্রে পড়াশোনার পর কমলা বলল,—গরবিনী আজ হঠাৎ এ বাড়ীতে এল যে ?

—রাস্তায় দেখা। আমাকে হেঁটে আসতে দেখে গাড়ীতে করে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। সেদিনের সে ব্যবহারের জন্যে ক্ষমাও চেয়ে নিল।

—বাব্বা! হঠাৎ এ সুমতি ?

—হয়ত মহেন্দ্র বাবু কিছু বলে থাকবেন।

—জমিদার তাহলে লোক ভাল।

—প্রজাদের খাজনা মাপ করে দিয়েছেন তিনি। ভাল বই কি।

কমলা একটু চুপ করে থেকে বলল,—তোমাকে একটা কথা বলব ?

—এত কিন্তু হচ্ছেন কেন ? বলুন না!

—তুমি একটা বিয়ে কর।

—হঠাৎ এ কথা!

—হঠাৎ নয়। কদিন থেকেই বলব বলব ভাবছি। তোমার বউ এলে আমিও একজন সঙ্গী পাব।

—ও, এই কথা!

—এড়িয়ে গেলে চলবেনা। আমাকে কথা দিতে হবে।

—বিয়ে করব কিনা, এই কথা বলতে হবে ?

—হ্যা।

—বিয়ে করবনা, এমন কোন প্রতিজ্ঞা করিনি। তবে এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিনি কখনও। নিজের ছোট সুখ, আত্মকেন্দ্রিক কোন কল্পনা আমার মনেও আসেনা।

—বিয়ে করলেই যে আত্মকেন্দ্রিক হতে হয়, এ কথা বললে মেয়েদের ছোট করা হয়।

—মেয়েদের অশ্রদ্ধা করে একথা আমি বলিনি। আমার চলার পথে সহধর্মিনী রূপ নিয়ে কেউ এসে দাঁড়ায়নি। যদি কোন দিন তার সন্ধান পাই, আপনাকে জানাব। আপনি না হয় কিছুদিন আপনার মা-বাবার কাছে গিয়ে থাকুন না ? সত্যিই আপনার এখানে সঙ্গীর অভাব।

—এখন কোথাও আমার যাবার ইচ্ছে নেই। রাত হয়েছে, খেয়ে নেবে এস।

বই পত্র নিয়ে চলে গেল কমলা।

পঁচিশ

অনেক খোঁজাখুজির পর রমার বন্ধুর সন্ধান মিলল। তাদের বাড়ীর পাশের এক দোকানদারের কাছে জানা গেল, দাঙ্গা সুরু হবার পরের দিন একখানা পুলিশের ভ্যানে করে ওদের বাড়ীর সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে, তা সে বলতে পারল না। তারা চলে যাবার পর, তালা ভেঙ্গে বাড়ী লুট হয়েছে।

থানায় গিয়ে অনিরুদ্ধ জানতে পারল, একজন পুলিশ অফিসারের আত্মীয়েরা ঐ বাড়ীতে থাকত। পুলিশ অফিসারটিই তাদের ওখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। পুলিশ অফিসারের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে, অনিরুদ্ধ তার সঙ্গে দেখা করতে চলল।

শ্যাম-বাজারের এক অন্ধ গলি। নম্বর মিলিয়ে সেই গলির একটা পুরোনো দোতালা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ। বাড়ীর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

জোরে জোরে কড়া নাড়ল অনিরুদ্ধ।

দোতালার জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি যুবতী মেয়ে প্রশ্ন করল,—আপনি কাকে চান ?

—আপনিই কি রেখা দেবী ?

—কোথা থেকে আপনি আসছেন ?

—মুলেন ষ্ট্রীটের মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী থেকে।

—আমি আসছি।

মেয়েটি নেমে এসে দরজা খুলে অনিরুদ্ধকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

অনিরুদ্ধ বলল,—রমা দেবী অপনাদের খোঁজে তালতলার বাসায় গিয়েছিলেন। সেখানে আপনাদের না দেখতে পেয়ে বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর অনুরোধেই আমি আপনাদের খুঁজে বের করেছি। আপনারা সবাই ভাল আছেন তো ?

—হ্যাঁ। রমারা কেমন আছে ?

—রমা দেবী ভালই আছেন। তবে শুনেছি,—মহেন্দ্রবাবু অসুস্থ।

—আপনার পরিচয় কিন্তু জানতে পারলাম না।

আমি ওঁদের একজন পরিচিত লোক। নাম, অনিরুদ্ধ চৌধুরী। আচ্ছা, আজ উঠি।

—একটু বসুন। বাবা, মামা কেউ বাড়ীতে নেই। এটা আমার মামার বাড়ী। মামাই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। ওঁরা হয়ত এখ্‌খুনি এসে যাবেন।

—অন্য একদিন না হয় আসা যাবে। জানেন তো, কারফিউ রয়েছে। এখন না বেরুতে পারলে অসুবিধা হবে।

—এক মিনিট বসুন, আমি আসছি।

একটু পরে এক কাপ চা আর কয়েকখানা বিস্কুট নিয়ে ফিরে এল রেখা।

—আবার এসব কেন ?

—মাত্র এককাপ চা। আপনি আমাদের খোঁজ করতে নিশ্চয়ই যথেষ্ট হয়রান হয়েছেন।

চায়ের কাপটি নিয়ে হেসে অনিরুদ্ধ বলল,—তা একটু ঘুরতে হয়েছে।

—রমাকে বলবেন, কলকাতার অবস্থা একটু ভাল হলে আমি গিয়ে জেঠামশাইকে দেখে আসব। এখন আমাকে বাইরে যেতে দেবে না।

—আচ্ছা, বলব। নমস্কার।

উঠে পড়ল অনিরুদ্ধ।

স্নেখাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে অনিরুদ্ধ দেখল, ট্রাম বন্ধ। শুনল, ধর্মতলার দিকে নাকি গোলমাল হয়েছে, তাই ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটু পরেই 'কারফিউ' সুরু হবে। রাস্তায় অন্য কোন যানবাহন নেই। মুস্কিলে পড়ল অনিরুদ্ধ।

একখানা পুলিশের ট্রাক আসতে দেখে, রাস্তায় লোকজন যা ছিল, দৌড়িয়ে পালাতে সুরু করল। অনিরুদ্ধ পালাবে কি পালাবেনা ইতস্ততঃ করতে করতে, তার পায়ে এসে একটি গুলি লাগল। রাস্তায় পড়ে গেল সে। পুলিশের গাড়ী তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে চলে গেল। পুলিশের গাড়ী থেকে গুলি করেছে। রাস্তায় লোকের ভিড় দেখলেই গুলি করত পুলিশ। তাই পুলিশের গাড়ী দেখলেই লোক দৌড়িয়ে পালাত।

পুলিশের গাড়ী চলে গেলে, কয়েকজন লোক এসে ধরাধরি করে অনিরুদ্ধকে পাশের এক দোকানে নিয়ে তুলল। দোকানের মালিক ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দোকানে টেলিফোন ছিল। এ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে দেওয়া হল।

অনিরুদ্ধের তখনও জ্ঞান ছিল। ডাক্তার বোস আর বিভাসের ফোন নম্বর দিয়ে তাদের এ দুর্ঘটনার কথা জানাতে অনুরোধ করল অনিরুদ্ধ।

এ্যাম্বুলেন্সে যখন অনিরুদ্ধকে উঠিয়ে দেওয়া হল, অনিরুদ্ধের তখন আর জ্ঞান নেই।

মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সি ওয়ার্ডে অনিরুদ্ধকে নিয়ে এসে তুলল এ্যাম্বুলেন্স। কিছু পরে ডক্তার বোস ও তার পরেই বিভাস এসে পৌঁছল মেডিকেল কলেজে।

সেই রাত্রেই অপারেশন করে অনিরুদ্ধের পা থেকে গুলি বের করা হল। সমস্ত রাত্রি বিভাস মেডিকেল কলেজের বারান্দায় বসে জেগে কাটিয়ে দিল। ডাক্তার বোস বাড়ী ফিরে গেল।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে অনিরুদ্ধের জ্ঞান ফিরে আসেনি। পরদিন সকালে সামান্য ক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরে আসার পর আবার সে

ঘুমিয়ে পড়ল। ডাক্তার বিভাসকে আশ্বাস দিল,—ভয়ের কোন কারণ নেই।

মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভাস গেল অনিরুদ্ধের বাড়ীতে।

কমলা ডাক্তার বোসের কাছে আগেই সব খবর পেয়েছিল। ডাক্তার বোসকে দিয়ে সীতার শ্বশুর বাড়ীতেও ফোন করে দুঃসংবাদ জানিয়েছিল কমলা।

বিভাস কমলাকে আনুপূর্বিক ঘটনা বলে জানাল,—পা অপারেশন করা হয়েছে। অনিরুদ্ধ এখন ঘুমুচ্ছে।

ইতিমধ্যে প্রবীব ও সীতাও এসে উপস্থিত হল। তখন সবাই মিলে মেডিকেল কলেজে রওয়ানা হল।

রুগীর কাছে তাদের যেতে দেওয়া হলনা। তবে তারা জানতে পারল, অনিরুদ্ধ ঘুমুচ্ছে।

তারা ফিরে এল। সীতা সেদিন কমলার কাছেই থাকল। প্রবীর বলল,—বিকেলে এসে সে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

বিকেলে আবার দেখা হবে বলে. বিভাসও বিদায় নিল তাদের কাছ থেকে।

ছাব্বিশ

দিন পনের পরে হাসপাতাল থেকে অনিরুদ্ধকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়েছে। পায়ের ঘা এখনও সারেনি। রোজ সকালে ডাক্তার বোস এসে ঘা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে যায়।

অনিরুদ্ধের বন্ধুরা দু'বেলা আসে। ঔষধপত্র আনা ও অন্যান্য সব কাজ তারাই করে। সীতা রোজই আসে দাদাকে দেখতে। প্রবীরও আসে। সীতার শ্বশুর শাশুড়ীও দুবার এসেছিলেন।

রমা আজকাল রোজই আসছে। আর, বেশ অনেকক্ষণ ধরে অনিরুদ্ধের কাছে থাকে সে।

অনিরুদ্ধের এ দুর্ঘটনার কদিন পর রমা এসেছিল অনিরুদ্ধের খোঁজে। রেখার মামা রমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁর মুখেই রমা জানতে পারে যে, অনিরুদ্ধ রেখাদের খোঁজে গিয়েছিল। তবে খবরটা অনিরুদ্ধ কেন রমাকে জানালনা,—তাই জানতেই রমা এসেছিল অনিরুদ্ধের বাড়ীতে। অনিরুদ্ধ তখন হাসপাতালে। কমলার মুখে রমা সব জানতে পারে।

রমা হাসপাতালে অনিরুদ্ধকে দেখতে যেত। এখন হাসপাতাল থেকে বাড়ী আসবার পর, রোজই সে বাড়ীতে আসছে।

রমার উপর কমলা প্রসন্ন নয়। আর রমার অনুরোধে তার বন্ধুর খবর করতে গিয়েই যে অনিরুদ্ধের এ অবস্থা—এ কথা জানতে পেরে রমার উপর কমলার মন আরও বিরূপ হয়ে উঠেছে। বেহায়া মেয়েটা রোজ আদিখ্যেতা করতে আসে কেন ?

সীতাও খুব পছন্দ করেনা রমাকে। রমা এলে সীতা তাকে এড়িয়ে চলে।

রমা বুঝতে পারে কমলা আর সীতা তার উপর প্রসন্ন নয়। তবুও সে আসে। অনিরুদ্ধের এ দুর্ঘটনার জন্যে রমা নিজেকে অপরাধী ভাবে। এই অপরাধ-বোধ রমাকে রোজ টেনে নিয়ে আসে। যতটা সময় থাকে, কথায় গল্পে অনিরুদ্ধকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে সে।

অনিরুদ্ধ জানে যে, সীতা আর কমলা রমাকে বিশেষ পছন্দ করেনা। রমা যে অনুতপ্ত আর তার ক্রমশঃ পরিবর্তনও লক্ষ্য করে অনিরুদ্ধ।

আজকাল অনিরুদ্ধের সংস্পর্শে এসে রমা সত্যিই বদলে গেছে। তার সে উগ্র আধুনিকতা মোটেই আর নেই। ভাবতে শিখেছে সে।

বেশ কয়েকমাস ভুগে সুস্থ হয়ে উঠল অনিরুদ্ধ। কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই এক প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দেশ ভাগ হয়ে গেল। দেশ ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ দেশ ছাড়ল।

ফল ফলতেও দেরি হলনা। ভয়াবহ আকারে বাস্তুহারা সমস্যা দেখা দিল।

সমস্ত দিন রাত্রি অনিরুদ্ধেরা এই বাস্তুহারাদের মধ্যে কাজ করতে লাগল।

আর রমা উদ্বাস্তুদের সেবায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এল অনিরুদ্ধের সঙ্গে কাজ করতে।

সাতাশ

মথুরাপুরেও ভাঙ্গন ধরল।

একে একে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে হিন্দুস্থানে পাড়ি জমাল। ঈশান মণ্ডলের তখন খুব অসুখ। চিকিৎসা করছিল মজুমদার মশায়ের ছেলে, রবী ডাক্তার। মণ্ডলকে দেখতে এসে রবী ডাক্তারও একদিন বলল,—সেও চলে যাবে।

ঘরে গ্রামের আরও কয়েকজন ছিল।

প্রসাদী জিজ্ঞাসা করল,—ক্যান, আপনি যাবেন ক্যান ?

—আমার আশে-পাশের সবাই তো চলে গেল। আর থাকতে ভরসা হয় না।

কারও মুখে কোন কথা জোগাল না। ভরসার কথা জোর করে কেউ বলতে পারল না।

—কত্তাদার এমন অসুখ, আপনি চল্যা গেলি দেখবি কিডা ?

প্রসাদীর কথা শুনে সবাই একযোগে তাকাল রবী ডাক্তারের দিকে।

রবী ডাক্তার ছাড়া সুজানগরে আরও তুইজন ডাক্তার ছিল। তারাও চলে গেছে। এখন শুধু মথুরাপুরে কেন, আশে-পাশের বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে একমাত্র রবী ডাক্তারই ভরসা।

রবী ডাক্তার প্রসাদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—আমি তো আজই যাচ্ছিনে। এর মধ্যে মোড়ল ভাল হয়ে উঠবে।

বৃথাই আশ্বাস দিয়েছিল রবী ডাক্তার। ভাল আর হল না ঈশান মণ্ডল। রবী ডাক্তার গাঁ ছেড়ে যাবার আগেই মারা গেল মোড়ল।

চারদিকে এত ওলোট-পালট, কিন্তু ক্ষিতু সরকারের বাড়ীতে ননী লাহিড়ীর সান্ধ্য-আসর ঠিক চলছে।

আলবোলায় টান দিয়ে নায়েব বলল,—কিরে পরাণ, আর কে গেল ?

—যাচ্ছে তো একে একে সগ্গলেই। থাকা আর যাবিন্যা এ গাঁয়ে।

—তুইও যাবি নাকি।

—আমি ক'নে যাব? না আছে আমার ঘর, না ঘরনী। আমার যাওয়ার মাথা ব্যথাডা কি?

পান সাজাছিল ক্ষিতুর বউ।

সে বলল,—ঘরনী তো আছেই তোর। মণ্ডল গেল, এবার পেসাদি থাকবি ক'নে? তার কাছে এবার তোর যাওয়া উচিৎ।

ক্ষিতুর বউ বলবার আগেই গিয়েছিল পরাণ। না প্রসাদীর কাছে নয়, কেদারের মায়ের কাছে। সরাসরি প্রসাদীর কাছে যেতে তার সাহসে কুলোয়নি।

প্রসাদীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় সে। মণ্ডল নাই। প্রসাদীর এখন একলা থাকা কি ভাল? তারপর দেশের ভাব-গতিকও ভাল না। কেদারের মাকে অনুরোধ জানাল পরাণ, প্রসাদীকে সে যেন বুঝিয়ে বলে।

পরাণের যুক্তি, অনুরোধ কেদারের মায়ের কাছেও অযৌক্তিক মনে হয়নি। আশ্বাস দিয়েছে পরাণকে, প্রসাদীকে সে বুঝিয়ে বলবে।

এত কথা কিন্তু কাউকে ভাঙ্গলনা পরাণ। ক্ষিতুর বউএর কথার

উত্তরে কিছুই বলল না সে। কাল কেদারের মায়ের কাছে সে জানতে যাবে, প্রসাদীর মত কি?

আজকের এসব কথায় কিন্তু নায়েবের মন নেই। ক'দিন থেকে কি যেন সে ভাবছে।

পরাণ বুঝতে পেরেছে, নায়েব ভয় পেয়েছে। বোধহয় সে পালাবার মতলব আঁটছে।

ক্ষিতু উপস্থিত থাকলেও এদের কোন আলোচনায় সে কোনদিন যোগদান করে না। মেঝেতে বসে সে মদ খাচ্ছিল। আজ হঠাৎ সে বলে বসল,—পেসাদী বড় ভাল মেয়ে রে পরাণ। ওকে নিয়ে তুই হিন্দুস্তানে চলে যা।

—তাই যাব ছোট কত্তা। ও যদি রাজী হয়, তয় তাই যাব।

পরাণের কথা শুনে ক্ষিতুর বউ আর নায়েব বিস্ময়ে একযোগে তার দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না।

ক্ষিতু উঠে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরাণও গেল তার পেছন পেছন।

ক্ষিতুর বউ খাটে উঠে নায়েবের বুকের কাছে ঘনীভূত হয়ে বসে বলল,—একে একে তো সবাই চলে যাচ্ছে। আর কি থাকা যাবি এখানে?

—আমিও তো তাই ভাবতিছি বুলুরাণী। ট্যাপার মা আর ট্যাপাকে আসামে নরেনের কাছে পাঠাব ঠিক করিছি।

ট্যাপা নায়েবের কনিষ্ঠ কন্যা। নরেন নায়েবের ছেলে। আসামে চাকরি করে।

—আর আমি, আমরা কি করব?

—আরে আমি তো আছি এখানে, ভয় কি? মহিন্দির রায়কে একখানা চিঠি দিছি। হিন্দুরা সব গাঁ-ছেড়ে যাচ্ছে, সবই লিখিছি। দেখি, কি উত্তর আসে। যদ্দিন পারা যায়, থাকতি হবিই আমাকে। তুমিও থাকবে। ভয় কি?

—তুমি থাকলে আর ভয় কি।

নায়েব বুলুরাণীর কোমরে হাত জড়িয়ে তাকে আরেকটু কাছে টেনে নিল। বুলুরাণী নায়েবের বুকের ওপর এলিয়ে পড়ল।

আটাশ

সকাল বেলাতেই পরাণ এসে উপস্থিত।

কেদারের মা তাকে বলল,—পেসাদি তোমাকে বিশ্বাস করে না। তুমি নাড়ি মশায়ের সাকরেদ।

শুনে পরাণের মুখটা বড় ম্লান হয়ে গেল।

সে বলল—আমাকে বিশ্বাস করেনা পেসাদি? আমি তার কি ক্ষতি করিছি? কও, তুমিই কও কেদারের মা?

—আমি কই, তুমি নিজিই যাও একবার পেসাদির কাছে। শোক-তাপ পাইছে, তোমার যাওয়াও তো উচিত।

—যাব্যার ইচ্ছে তো করে। কিন্তুক লোকে না কয়, বুড়্যা মরিছে তাই সম্পাত্তির লোভে লোভে আইছে পরাণ।

—লোকে কত কি কয়, কান দিলি কি চলে? তোমার বউ। তার বিপদে-আপদে তুমি যদি না যায়্যা খাড়াও, তয় তার মনডা তোমার ওপর হবি কিসি?

—তা তুমি ঠিকই কইছ! কিন্তুক ভয় করে। বুড়্যা আদর দিয়্যা উয়্যার মাথাডা খাইছে। মেজাজের উয়্যার হদিস পাওয়া যায় না।

হদিস নিব্যার গিছিল্যা যে, পাও নাই? কথাডা তা না, তোমার মনের কু তুমি জান। তাই পেসাদির কাছে যাতি ভয় পাও।

—কথার পিঠি কথা হয়। থাকগে সেসব কথা। যাবনে আজ। নিজিই যাব। তয়, উঠি এ্যাখন।

—আচ্ছা, অ্যাস।

কেদারের মায়ের বাড়ী থেকে ফেরার পথেই পড়ে ঈশান মণ্ডলের

বাড়ী। বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় পরাণ মুখ উঁচু করে দেখল, উঠোনে কেউ আছে নাকি। না, কেউ নেই। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আস্তে আস্তে উঠে এল বাড়ীর মধ্যে।

—আছে নাকি কেউ বাড়ী? বাড়ীর লোকজন কই?

বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রসাদী। পরাণকে দেখে সে মোটেই বিস্মিত হল না। লজ্জিতও হল না।

স্বাভাবিকভাবেই সে বলল,—বাড়ীর লোক দিয়্যা দরকারডা কি?

কুণ্ঠিতভাবে পরাণ বলল,—না, কইযে কত্তাদার কাজের তো দিন আর বেশী বাকি নাই। তা কি ব্যবস্থা করতিছ, তাই জানবার আল্যাম।

—সে কথা জান্যা তোমার কামডা কি?

ঈশান মণ্ডল বেঁচে থাকতে, প্রসাদীর সঙ্গে এঁভাবে কথা বলবার সুযোগ পরাণ কোনদিন পায়নি। আজ এই সুযোগে তার মনের কথা প্রসাদীকে জানাতে চায়। তার অন্তর্বেদনা ব্যক্ত করে, প্রসাদীর মনে সমবেদনা জাগাতে চায়।

বলল,—তুমি রাগ কর ক্যান পেসাদি? আমার দোষডা কি? তোমরা আমাক তফাঁৎ কর্যা রাখিছ,—ব্যাভারডা তো তোমাদের কাছে ভাল পাই নাই কোনদিন।

—যার যেমন স্বভাব, ব্যাভারতো সেই রকমই পায় লোকে।

—জেলে গিছিলাম, তাই তোমরা আমাক ঘেন্না কর। কিন্তুক ক্যান আমার এমন মতি হইছিল সে খবর কি কোনদিন রাখিছ?

—সে খবরে আমার কি কাম?

—না, তোমার আর কি কাম! বিয়্যা হইছিল তোমার সাথে এ কথাডাই তো তোমরা স্বীকার করবার চাও নাই। দোষ আমার অদৃষ্টের পেসাদি, তোমার কোন দোষ নাই।

একটু চুপ করে থেকে প্রসাদী বলল—ওসব কথা কত্তাদা জানত। যা সে ভাল বুঝিছে, সেইমত কাজ করিছে।

—তা আমি জানি পেসাদি। আমি গরীব বল্যা কত্তাদা তোমাক আমার ঘরে পাঠাব্যার চায় নাই। জ্বালা ধরিছিল আমার বুকে। পণ করিছিল্যাম,—আমার ঘরে তোমাকে নিয়্যা যাবই। কিন্তুক পণ রক্ষা হবি কি কর্যা? হাল-গরু নাই যে জমি নেব ভাগে, পয়সা কড়িও নাই যে ব্যবসা করব। কি করি? দুর্বুদ্ধি হল। তোমাক ঘরে আনার চিন্তায় কিছুই আমার অসাধ্য ছিল না। চুরি করল্যাম। অদেষ্ট মন্দ, ধরা পড়্যা জেলে গেল্যাম। জেল থিক্যা ফির্যা দেখল্যাম,—ঘেন্না কর্যা কেউ কথাও কয় না। মা মরিছে গলায় দড়ি লাগায়ে। কনে যাই? কি খাই? তোমার কথা তখন মনে হল। ভাবল্যাম এ অসময়ে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। কিন্তুক কত্তাদা আমাক অপমান কর্যা তাড়ায়ে দিল। সে সময় নাড়িমশাই আমাক বাঁচাইছিল। লোক সে খুবই মন্দ, কিন্তুক সে সময় এক সেইত আমাক আশ্রয় দিছিল। তাই তার কাছেই আশ্রয় নিল্যাম। না নিলিই বা খাত্যাম কি? তুমি যদি সে সময় মুখ ফুট্যা এট্টা কথাও বলতে পেসাদি—! আমি কত আশা করিছিল্যাম! যাক্ সে সব কথা। আমার মন্দ অদৃষ্টের কথা। আমি যাই।

একটা লোক এমন করে তার অন্তরের ব্যথা জানাল, প্রসাদীর মনও একটু আর্দ্র হল।

পরাণ চলে যাচ্ছিল। প্রসাদী বলল,—গাঁয়ের সবাই কয়, কত্তাদার কাজ ভাল কর্যা করা চাই। কাল আইছিল রূপ মণ্ডলরা, ফন্দ ধরিছে লাম্বা। জমি বিক্রী করতি হবি। খদ্দের যদি থাকে খবর দিও।

—জমি বেচ্যা কত্তাদার কাজ হবি?

—তা ছাড়া টাকা প্যাব ক'নে?

—ঘরে কি নগদ কিছুই নাই?

—আছে, গোটা পঞ্চাশেক টাকা। ও টাকা দিয়্যা তো হবিনা সব।

—আচ্ছা, পরে আসবোনে।

কথা দিয়ে পরাণ সেইদিনই সন্ধ্যায় আবার এল।

দাওয়ায় মাদুর পেতে তাকে বসতে দিল প্রসাদী। নিজে ঘরের মধ্যে চৌকাঠের পাশে বসল।

প্রসাদী জিজ্ঞাসা করল,—খদ্দের পাওয়া গিছে ?

—না।

—নাড়ি মশায় তো নিতি পারে ?

—কই নাই তাক। জমি তোমার বেচ্যা দরকার নাই পেসাদি।

প্রসাদী পরাণের কথার কোন উত্তর দিলনা।

—কত্তাদার কাজের ভারডা আমাক দাও তুমি।

—না, তা হয় না।

—ক্যান পেসাদি, আমাক কি এতই ঘেন্না কর তুমি ?

—ঘেন্নার কথা না। যা হয় না, তাই ক্যলাম।

এ কথার পর পরাণ আর কথা খুঁজে পেলনা। অনেক কথা গুছিয়ে বলবে, ভেবে এসেছিল। কিন্তু কিছুই তার বলা হলনা। মনের মধ্যে সব কথা তাল-গোল পাকিয়ে গেল। হঠাৎ বলে ফেলার মত সে বলে বসল,—গাঁয়ের সগ্গলে হিন্দুস্তানে যাতিছে, নাড়ি মশায়ও যাওয়ার তাল খুঁজতিছে। তুমি কি করব্যা পেসাদি ?

হেসে ফেলল প্রসাদী। বলল,—আমি আবার ক'নে যাব ?

—ক্যান, কলকাতায়। যদি কও তো, আমি সব ব্যবস্থা কর্‌য্যা দিই। এখ্যানে আর থাকা যাবিন্যা। তোমার ভালর জন্যেই কতিছি। চল কলকাতায় যাই।

—তুমিও যাব্যা নাকি ?

—তুমি গেলি, আমাক তো যাতিই হবি।

—কর্ত্তাদার কাজ তো আগে মিটুক, সে সব পরে ভাবা যাবিনি।

পরাণ বুঝল, প্রসাদীর কলকাতায় যেতে বিশেষ আপত্তি নেই। উৎসাহিত হয়ে উঠল পরাণ। বলল,—কলকাতায় যদি যাওয়াই ঠিক হয়, তয় জমি বেচতি পার। জমি বেচ্যা কত্তাদার কাজ মিটায়ে, তারপর চল এ ত্যাশ ছাড়্যা যাই আমরা।

—জমি না বেচলি কত্তাদার কাজ হবিন্যা। তুমি খদ্দের দেখ।

—আচ্ছা।

উঠে পড়ল পরাণ।

ঊনত্রিশ

শুধু সেদিনই নয়, প্রায়ই পরাণ আসতে লাগল প্রসাদীর কাছে।

প্রসাদী পরাণের বিয়ে করা বউ। পরাণ প্রসাদীর কাছে এলে, কার কি বলার আছে ? প্রসাদীর ভাল চায় যারা, তারা বরঞ্চ এতে স্বস্তি অনুভব করল। মেয়েটার তবুও একটা হিল্লে হল। তারা এখন যদি মিলে-মিশে ঘর-কন্না করে তো ভালই।

ঈশান মণ্ডলের শ্রাদ্ধের ব্যাপারেও পরাণ কর্তৃত্ব করল।

পরাণের ব্যবস্থায় খুঁত নেই। গাঁয়ের মাতব্বরদের কাছে সে সব সময়েই বিনীত। সব ব্যাপারেই তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করে সে। পরাণের ওপর আর অসন্তুষ্ট কেউ নয়।

জমি বিক্রী করেই ঈশান মণ্ডলের শ্রাদ্ধ হল। শ্রাদ্ধে কোন খুঁত নেই। বাহুল্য ঘটাও করেনি পরাণ। কিন্তু জমি সে বিক্রী করেছে সব,—ঈশান মণ্ডলের সব জমি। শুধু বসত বাড়িখানা বিক্রী করতে দেয়নি প্রসাদী।

ক্রমে সবাই শুনল, প্রসাদীকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে পরাণ। জোর করে বাধা দিল না কেউ। কেননা, তারা অনেকেই গাঁ ছেড়ে যাবার কথা ভাবছে। যাদের সামর্থ আছে, প্রথমেই তারা গাঁ ছেড়েছে। যারা এখনও আছে তাদের মধ্যে অনেকেই যাবে। যাওয়ার কথা ভাবছে না শুধু যাদের যাবার কোন উপায় নেই তারাই।

কেদারের মা যাবেনা কোথাও। সম্বলের মধ্যে তার কুঁড়েখানি মাত্র। লোকের বাড়ী ধান-ভেনে আর শাক পাতা কুড়িয়ে কোনমতে কেদারকে নিয়ে সে দিন গুজরাণ করে। অন্য কোথাও গেলে হয়ত না খেয়ে মরতে হবে তাকে। কুঁড়েখানি বিক্রী করে হয়ত তার পথ খরচাও জুটবেনা।

প্রসাদী চলে যাবে শুনে ভয় পেল কেদারের মা। বাড়ীর পাশে প্রসাদীরাই ছিল তার বল-ভরসা।

প্রসাদীকে নিষেধ করল কেদারের মা।

কিন্তু পরাণের চেয়ে তারই তখন কলকাতা যাবার আগ্রহ বেশী। কলকাতা যেন তাকে টেনেছে। রাঙ্গা দাদাবাবু আছে কলকাতায়। রাঙ্গা দাদাবাবুর খবর আর কিছু পায়নি সে। মনে মনে অভিমান হয়েছে তার, তবুও বিশ্বাস করে প্রসাদী, রাঙ্গা দাদাবাবু তাকে ভুলে যায়নি।

কেদারের মায়ের ওপর বাড়ীর দেখাশোনার ভার দিয়ে পরাণের সাথে একদিন ভেসে পড়ল প্রসাদী।

ভেসে যে সে সত্যিই পড়েছে প্রথমে বুঝতে পারেনি, পারল শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে। বিরাট সর্বহারা যাযাবর-গোষ্ঠির যেন মেলা বসেছে সেখানে। পা ফেলবারও এতটুকু ঠাঁই নেই।

ষ্টেশনে তাদের মধ্যে দু'দিন কাটল প্রসাদীদের। সব দেখেশুনে পরাণও যেন কেমন মন মরা হয়ে গেছে। নায়েব মশায়ের সুযোগ্য সহচর দুর্ধর্ষ পরাণ কলকাতার প্রথম অভিজ্ঞতায় দিশেহারা হয়ে পড়ল।

তৃতীয় দিনে প্রসাদীই পরাণকে উৎসাহ দিয়ে ঘর খুঁজতে পাঠাল। কলকাতার রাস্তাঘাট পরাণ কিছুই জানে না। ষ্টেশনে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পরাণ আর

প্রসাদীর। সবারই প্রায় এক অবস্থা। সকলেই সমব্যথী। তারাও ঘর খুঁজছে। তাদের সঙ্গে পরাণও গেল ঘর খুঁজতে।

পরাণ গেল আর ফিরল না। যাদের সঙ্গে সে গিয়েছিল একে একে সবাই ফিরে এল। পরাণ এলনা। প্রসাদী তাদের কাছে খোঁজ করে জানল,—তারা সবাই একসঙ্গে ছিল না। প্রত্যেকেই আলাদা রাস্তায় ঘর খুঁজছিল। হারানোর ভয় নেই। রাস্তা না চিনলেও, শিয়ালদা ষ্টেশনের নাম করলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। সেই ভাবেই তারা ফিরে এসেছে। ঘরের সন্ধান অবশ্য কেউই পায়নি।

সন্ধ্যার দিকে প্রসাদী রিলিফ কমিটির একটি বাবুকে বলল, পরাণের না ফেরার কথা।

একা একা এরকম যাওয়ার জন্য বাবুটি পরাণের উদ্দেশ্যে শুধু গাল-মন্দই করল। শেষে প্রসাদীকে বলল,—খোঁজ পেলে তোমাকে জানাব। হয়ত গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়েছে। হাসপাতালে সন্ধান নিতে হবে।

প্রসাদী বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করল, অনিরুদ্ধকে সে চেনে নাকি?

বাবুটি চেনেনা অনিরুদ্ধকে। প্রসাদী অনিরুদ্ধের ঠিকানা জানে না। ভেবেছিল কলকাতায় গিয়ে রাঙ্গাদাদাবাবুর নাম করলে লোকে তার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। কলকাতা সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা থাকলে, লজ্জার মাথা খেয়ে মজুমদার মশায়ের কাছ থেকে অনিরুদ্ধের ঠিকানা সে জেনে নিত। মজুমদার মশায়কে অনিরুদ্ধ চিঠি দিয়েছিল, তার ঠিকানা হয়ত মজুমদার মশায় জানেন।

পরাণের জন্য অপেক্ষা করে করে শেষে রাত্রে দু'মুঠো শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে শুয়ে পড়ল প্রসাদী। ঘুম এলনা তার।

রাত তখন বেশ বেশী। প্রসাদী কল ঘরে যাবার জন্যে উঠল।

কল ঘরের পাশে একটু অন্ধকারমত জায়গায় একজন ভদ্রলোককে একটি মেয়ের সঙ্গে চাপা-কণ্ঠে কথা বলতে শুনল প্রসাদী।

মেয়েটিকে চিনতে পারল সে। তারই পাশে যে উদ্বাস্তু পরিবার আস্তানা নিয়েছে—তাদের যুবতী মেয়ে।

ফিরে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল প্রসাদী। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটিতো এখনও এল না, রাত যে শেষ হতে চলল। সারা রাতের মধ্যে প্রসাদী একটুকুও ঘুমুতে পারেনি।

হঠাৎ দেখল, পুলিশ এসে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে টেনে তুলে গরু-ভেড়ার মত ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে

প্রসাদী আগেই শুনেছিল, পুলিশ নাকি হঠাৎ এরকম মাঝ-রাত্রে হানা দিয়ে উদ্বাস্তুদের কলকাতার বাইরে আশ্রয় ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেই সব আশ্রয় ক্যাম্পের কদর্য ব্যবস্থার কথা অনেকেই জেনে ফেলেছে। তাই সহজে সেখানে কেউ যেতে চায় না। সেইজন্যে নাকি এইরকম অতর্কিত আক্রমণ চলে।

প্রসাদী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভীত হয়ে পড়ল। পাশের পরিবারটির দিকে তাকিয়ে দেখল, স্বামী স্ত্রী কয়েকটি নাবালক পুত্র-কন্যা নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তাদের বড় মেয়েটি তখনও ফেরেনি। হয়ত সে আর ফিরতেও পারবে না।

পুলিশ এদিকে আসবার আগেই প্রসাদী উঠে পড়ল। সন্তর্পণে পালিয়ে গেল সে। পড়ে রইল তার জিনিষপত্র বাক্স-বিছানা। বাক্সের মধ্যে জমি-বিক্রীর টাকাও কিছু ছিল। তাড়াতাড়িতে তাও নেওযা হল না।

একাকিনী, রিক্তা, নিঃসহায়-যুবতী সুপ্ত-মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথে এসে দাঁড়াল।

* * *

তারপর কত ঘুরে, কত আশ্রয় ত্যাগ করে, কত কষ্ট পেয়ে আর কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রসাদী সদা ঠাকুরের 'পবিত্র ভোজনালয়' এর কর্মঠ ঝিতে রূপান্তরিত হল।

তিরিশ

ইতিমধ্যে প্রায় বছর দুয়েক কেটে গেছে।

রমা এখন অনিরুদ্ধের সংঘের একজন বিশিষ্ট নারী-কর্মী। দেশ বিভাগের পর প্রথম উদ্বাস্তুদের সেবায় রমা আত্মনিয়োগ করেছিল। তারপর থেকে সে জনসেবার কাজে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে।

কাজের মধ্যে রমার মনেরও পরিবর্তন হয়েছে যথেষ্ট। রুচিও বদলে গেছে তার। মিঃ কনক চৌধুরীর দাম্ভিকতা, অন্তঃসারশূন্য আদব-কায়দা আর ভাল লাগেনা রমার। মিঃ চৌধুরী রমার অনিরুদ্ধের সংগে মেলামেশা পছন্দ করেনা। তাদের সংঘ সম্বন্ধে মিঃ চৌধুরীর অযথা কটূক্তি বরদাস্ত করতে পারে না রমা। মিঃ চৌধুরীর কটূক্তির প্রতিবাদ করে সে। কিন্তু রমার প্রতিবাদে মিঃ চৌধুরীর ভাষা আরও বেশী তীক্ষ্ণ ও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। রমা তাই আজকাল মিঃ চৌধুরীর সঙ্গ এড়িয়ে চলে। মিঃ চৌধুরীকে সে আর সহ্য করতে পারেনা।

আজকাল রমার দেখা মিঃ চৌধুরী আর বিশেষ পায় না। ফোন করে তাকে থাকতে বলেও, বাড়ীতে এসে মিঃ চৌধুরী জানতে পারে, বিশেষ কাজে রমা বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে, ফিরতে দেরী হবে। রমা যে ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে চলছে, বুঝতে পারে মিঃ চৌধুরী। আর অনিরুদ্ধই যে এর মূল কারণ তাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না তার।

রমার উদ্বাস্তুসেবা আর জনহিতকর কাজে যোগ দেওয়ায় মহেন্দ্র-বাবু কোন দোষ দেখতে পাননি। বরঞ্চ পরোক্ষে যে তাঁর সম্মতি আছে তা বোঝা যায়। মিঃ চৌধুরীও বোঝে সে কথা। তাই রমার পরিবর্তনে নিজের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ও আক্রোশ থাকলেও অনেকাংশে মনের ভাব চেপে রাখে মিঃ চৌধুরী।

সম্প্রতি রমার বি, এ, পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মহেন্দ্রবাবু এবার তার বিয়েটা সেরে ফেলতে চান। মিঃ চৌধুরীর এ বিষয়ে যে আগ্রহ সমধিক, বলাই বাহুল্য। কিন্তু রমার কাছে ব্যাপারটা এক প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিয়েতে রমার ইচ্ছে নেই। অথচ মহেন্দ্রবাবুকে সে সব খুলে বলতেও পারছেনা।

রমার বন্ধু রেখা একদিন রমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এল। বর্ধমান কলেজের এক প্রোফেসারের সঙ্গে রেখার বিয়ে হয়েছে প্রায় ছয় মাস আগে। বিয়ের পর রমার সাথে তার দেখা-শোনা হয়নি অনেকদিন। মাঝে একবার বাপের বাড়ীতে এসে, রেখা রমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। এবার অনেকদিন পরে সে কলকাতায় এসেছে।

রমা বলল,—তারপর তোর উনি কোথায় ?

—বর্ধমানে।

—সে কিরে! তুই না লিখেছিলি, তোকে ছেড়ে ভদ্রলোক একদিনও থাকতে পারেন না ?

—সেটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। সামনের সপ্তাহেই এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই ক'দিনেই দেখব,—সব ওলোট-পালোট লণ্ডভণ্ড অবস্থা! বিয়ের আগে যে ওর কি করে চলত, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

মনে হচ্ছে, ভদ্রলোককে ছেড়ে তুইই থাকতে পারিস না।

রেখা একটু হেসে বলল,—তোর খবর বল। মিঃ চৌধুরী কেমন আছেন। এবার তো বি, এ, পরীক্ষা দিলি, বিয়েটা সেরে ফেল।

—সেইটাই তো আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—সমস্যা ?

—হ্যাঁরে, বিয়ে করতে আর ইচ্ছে নেই।

—উঁহুঁ। তাতো ঠিক নয়। আসল কথাটা কি, বলত ?

—ঠিকই বলছি। ভাবছি, বাবাকে বলব।

—কি বলবি? মিঃ চৌধুরীকে আর মনে ধরছেনা। অনিরুদ্ধ-বাবু হলে বুঝি তোর আর অনিচ্ছে থাকবে না, কেমন?

—কি যা-তা বলছিস।

—যা-তা নয়, ঠিকই বলছি। অবশ্য অনিরুদ্ধবাবুর মুখে তোর প্রশস্তি শোনবার পর, কিছুটা অনুমান করেছিলাম। এখন নিঃসন্দেহ হলাম।

—অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে তোর কবে দেখা হল? কি বলেছেন তিনি?

—বাপস্। তুই যে একবারে ব্যস্ত হয়ে উঠলি। না, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। ক'দিন আগে ও কলকাতায় এসেছিল, কলেজের কাজে। অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে ওর দেখা হয় হঠাৎ। ওরা দু'জন একসঙ্গেই এম. এ. পাশ করেছে। পুরোনো দু'বন্ধুতে অনেক কথাই হল। তোর কথা জানালেন অনিরুদ্ধবাবু। তুই নাকি যথার্থ দরদী কর্মী। এতদিন কুয়াসায় তোর মন নাকি আচ্ছন্ন ছিল। তোর নাম শুনেই ও তোকে চিনতে পেরেছিল। আমার কাছে আগেই তো শুনেছে তোর কথা—তাই। ও বলল, মেয়েদের মিথ্যে প্রশস্তি গাইবার লোক অনিরুদ্ধবাবু নন। অনিরুদ্ধবাবুর মুখে তোর প্রশংসা শুনে, অনুমান করলাম ব্যাপার ঘোরালো।

—অনিরুদ্ধবাবুকে তুই সামান্য ক্ষণের জন্যে দেখিছিলি,—তাকে চিনতে পারিসনি তুই। ধরা ছোঁয়ার বাইরে তিনি।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোর অবস্থা যে বড় সঙ্গী মনে হয়।

—আমি তোর কাছে লুকোবনা। কিন্তু হীরের যেমন ঔজ্জ্বল্য ও আকর্ষণী, কঠিনত্বেও সে শ্রেষ্ঠ। হীরে পাবার সৌভাগ্য হয়ত আমার নেই। কিন্তু হীরেকে যে চিনেছে, কাঁচ নিয়ে সে কি সুখী হতে পারে?

—সবই তো বুঝলাম, এখন তবে কি করবি?

—তাইতো সমস্যায় পড়েছি। বাবার শরীর ভাল যাচ্ছেনা, বিয়েটা উনি সেরে ফেলতে চান।

—অনিরুদ্ধবাবু কি তোর মনের খবর জানে না?

—বোধহয় না। আমার কাজে নিষ্ঠা দেখে তিনি হয়ত প্রশংসা করেছেন বন্ধুর কাছে। কিন্তু কোন মেয়ের মনের খবর জানবার তাঁর অবসর কোথায়?

—এত বড় পুরুষ?

—তাই তো তার এত আকর্ষণ।

ঝি এসে জানাল ব্যারিষ্টার সাহেব এসেছেন কর্তাবাবুর ঘরে। কর্তাবাবু দিদিমণিকে ডাকছেন।

ঝি চলে যেতে, রেখা বলল,—আমি এখন তবে যাই।

—বসনা একটু। বাবার কথা শুনে আসতে আমার দেরি হবেনা।

আমিও বেরুবো ভাবছিলাম। তোকে না হয় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।

—কিন্তু মিঃ চৌধুরী এসেছেন যে।

—সেই জন্যেই তো পালাতে চাই।

—এমনি করে কতদিন আর পালিয়ে থাকতে পারবি?

—বোধহয় বেশীদিন নয়। মন চায় পালাতে, কিন্তু মনের মত সব কি হয়? তুই বস, আমি আসছি।

রমা চলে গেল।

মিঃ চৌধুরী মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল।

রমাকে দেখে মহেন্দ্রবাবু বললেন—এস মা! কনক বলছিল, ওর পিসিমা কাশী থেকে এসেছেন। তিনি তোমাকে দেখেন নি। তাই কনককে দিয়ে আজ দুপুরে আমাদের দু'জনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। আমি তো এই শরীরে যেতে পারব না। তুমি না হয় যেও।

—আমি যে রেখার সঙ্গে একবার বেরুচ্ছি বাবা!

—রেখা মা এসেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

কনক বলল,—তা বেশ তো, কতই দেরী হবে আপনাদের ?

—বলতে পারছিনা। একটু কাজও রয়েছে।

—এখন তো দশটা। আমি না হয় এখন যাই কাকাবাবু! মিস রায় ওঁর কাজ সেরেই যাবেন, আমরা অপেক্ষা করব।

দেখুন মিঃ চৌধুরী, কাজে হয়ত আমার দেরি হয়ে যেতে পারে। তাই বলছিলাম অনর্থক আমার জন্যে আপনারা অপেক্ষা করবেন না। আমি না হয় বিকেলের দিকে একবার যাব।

কনক বলল,—আপনি কি পিসীমার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন না মিস্ রায় ?

—আমার কাজ ক্ষতি করে যেতে পারছিনা বলে যদি আপনি তাই মনে করেন, তবে আমার কিছু বলার নেই।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—রুমি, যাও তোমার কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এস। উনি নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন, না গেলে দুঃখিত হবেন। উনি সেকালের মানুষ, আজকালকার মেয়েদের কাজের কথা হয়ত বুঝবেব না।

—আগে থেকে এ নিমন্ত্রণের কথা জানতে পারলে, কোন অসুবিধা হত না বাবা! বেশ আমি যাব।

কনক বলল,—আগে থেকে পিসিমা আমাকে কিছু বলেন নি। আজ সকালেই বললেন। আপনার কাজের ক্ষতি হল বলে আমিও দুঃখিত। আচ্ছা আমি উঠি কাকাবাবু।

মিঃ কনক চৌধুরী চলে যেতেই রমা বলল,—এরকম নিমন্ত্রণের আছিলা করে বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়ে মেয়ে দেখায় আমি অপমানিত বোধ করি বাবা। শুধু তোমার জন্যেই আমি যেতে রাজি হলাম।

—তোর মাসি-পিসি থাকলে তারাও হয়ত এরকম করত।

এসবে ওরা দোষ ধরে না। সব দিকে মানিয়ে চলতে হয় মা, রাগ করতে নেই।

রমা আর কথা না বলে চলে গেল।

রমা ফিরে আসতে রেখা প্রশ্ন করল,—কিরে, এত কি ব্যাপার? মিঃ চৌধুরীও চলে গেলেন দেখলাম।

—ব্যাপার আর কি, মেয়ে দেখা! মিঃ চৌধুরীর পিসী এসেছেন কাশী থেকে। তাই নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, মেয়ে দেখা। শুধু বাবার জন্যেই আমাকে এই অপমানকর প্রস্তাবে রাজী হতে হল।

হেসে রেখা বলল,—অনেক দেরি হয়ে গেল। চল, জেঠামশায়কে প্রণাম করে যাই।

রেখা আর রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একত্রিশ

নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বিকেলে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে বাড়ী ফিরছিল রমা। মিঃ চৌধুরী ড্রাইভ করছিল। রমা ছিল তার পাশে। এক বিপর্যয় ঘটল।

আশুতোষ মুখার্জী রোড ধরে এসে পদ্মপুকুরে গাড়ী যেই মোড় ঘুরেছে, একটি ছোট ছেলে রাস্তা পার হতে গিয়ে একেবারে গাড়ীর সামনে এসে পড়ল। ব্রেক কষতে কষতে ছেলেটির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল গাড়ী। পড়ে গেল ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে চারিদিক থেকে লোকে চিৎকার করে উঠল। রমা গাড়ীর দরজা খুলে নেমে পড়ছিল। মিঃ চৌধুরী রমার হাত চেপে ধরে বাধা দিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিল।

রমা ষ্টিয়ারিং চেপে ধরে বলল,—ছিঃ, মিঃ চৌধুরী। গাড়ী থামান।

ইতিমধ্যে চারপাশ থেকে লোক এসে গাড়ী ঘিরে ফেলেছে। ষ্টিয়ারিং চেপে ধরে রমাকে গাড়ী থামাতে দেখে কয়েকজন উত্তেজিত

লোক গাড়ীর দরজা খুলে, মিঃ চৌধুরীকে জোর করে গাড়ী থেকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে নিল।

রমাও তাড়াতাড়ি ষ্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। লোকগুলো তখন মিঃ চৌধুরীকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত, আহত ছেলেটির দিকে তাদের লক্ষ্য নেই।

রমা বলল,—দেখুন, আগে আহত ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

রমার কথায় অদ্ভুত কাজ হল। লোকগুলো মিঃ চৌধুরীকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ীর নীচে থেকে আহত ছেলেটিকে টেনে বার করল। ছেলেটির একটি পা একেবারে থেতলে গেছে। শরীরের অন্যান্য অংশেও বেশ আঘাত লেগেছে। ছেলেটির সে ভয়াবহ দৃশ্যে রমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। ইতিমধ্যে কোথা থেকে অনিরুদ্ধ ঠিক তখনই ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হল। ব্যাপার দেখে কাউকে কিছু না বলে, আহত ছেলেটিকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গাড়ীর পিছনের সিটে শুইয়ে দিল। তারপর রমা ও মিঃ চৌধুরীকে বলল,—আপনারাও উঠে পড়ুন।

যন্ত্র-চালিতের মত মিঃ চৌধুরী গিয়ে ষ্টিয়ারিংএ বসল। রমা উঠে তার পাশে বসল। পেছনের সিটে অনিরুদ্ধ উঠল।

তারপর জনতার দিকে লক্ষ্য করে অনিরুদ্ধ বলল,—আপনারা ভাই, একটু রাস্তা দিন। এখুনি একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

সম্মুখের লোকগুলো সরে গিয়ে পথ করে দিল। ট্রাফিক পুলিশও ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে গিয়েছিল। সে শুধু গাড়ীর নম্বরটি টুকে নিল খাতায়।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে মিঃ চৌধুরীকে বলল অনিরুদ্ধ,—শম্ভুনাথ হাসপাতালে চলুন।

এমারজেন্সি ওয়ার্ডে ছেলেটিকে ভর্তি করে দেওয়া হল।

হাসপাতালে অনিরুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে রমা সর্বক্ষণই ঘুরেছিল। মিঃ চৌধুরী কিন্তু গাড়ী থেকে নামেনি। অনিরুদ্ধের সঙ্গেও সে কোন কথা বলেনি।

রমা আর অনিরুদ্ধ মিঃ চৌধুরীর কাছে ফিরে এল। মিঃ চৌধুরী গম্ভীর মুখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে রমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

রমা মিঃ চৌধুরীকে বলল,—আপনি এবার যেতে পারেন মিঃ চৌধুরী। আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। ছেলেটির জ্ঞান ফেরেনি। আমি বাবাকে এখান থেকে ফোন করে সব জানিয়ে দেব।

—একটা ষ্ট্রীট বয়, তার জন্যে এতটা—

মিঃ চৌধুরীর কথার মাঝেই রমা মিঃ চৌধুরীকে তিরস্কার করে জোরে বলে উঠল,—আঃ! মিঃ চৌধুরী!

কিন্তু মিঃ চৌধুরী রমার ওপর যথেষ্ট চটেছিল। সে বলল,— আপনার জন্যেই তো এই ফ্যাসাদ। স্পীডে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেউ ধরতে পারত না।

অনিরুদ্ধ এতক্ষণ নির্বাক দর্শক হয়েই এদের কথা শুনছিল। মিঃ চৌধুরীর কথা শুনে বলল,—আপনাকে পালাতে না যেতে দিয়ে উনি ঠিকই করেছেন।

—কতকগুলো গুণ্ডার হাতে মার খেয়ে আমার হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে গেলে বোধ হয় আরও ভাল হত।

—আশ্চর্য আপনার শিক্ষা, সভ্যতা! আপনার হৃদয়ও কি নেই? একটি নিরপরাধ বালক আপনার গাড়ীর নীচে পড়ে মারা যেতে বসেছে, তার জন্যে আপনার মনে এতটুকু দুঃখ বোধ নেই?

—সে নিজের দোষে চাপা পড়েছে, এতে আমার কোন অপরাধ হয়নি। কিন্তু আপনি কে?

—যে লোকগুলোর হাতে মার খেয়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে যেত বলছিলেন, তাদের হাত থেকে আজ আমিই আপনাকে বাঁচিয়েছি, এটুকুই আমার সম্বন্ধে আপনি মনে রাখবেন।

রমা বলল,—অনিরুদ্ধবাবু চলে আসুন। একজন পশুর সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ ?

মিঃ চৌধুরীর সমস্ত মুখ রাগে আর অপমানে লাল হয়ে উঠল। ব্যঙ্গ করে মিঃ চৌধুরী বলল,—ও আপনিই তা হলে 'হিরো, অনিরুদ্ধ'। ভাল, ভাল। এখন বুঝতে পেরেছি, রমা দেবী আমার ওপর এত বিরূপ কেন ? আপনার সম্বন্ধে কিছু শোনা আছে মশায়, আজ দেখে নয়ন সার্থক হল।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল মিঃ চৌধুরী।

—নয়ন আপনার এর আগেও একদিন সার্থক হয়েছে মিঃ চৌধুরী। রমা দেবীর বাড়ীতে এর আগেও একদিন আমায় দেখেছেন আপনি।

সে কথার উত্তর না দিয়ে অনিরুদ্ধের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাড়ী ছেড়ে দিল মিঃ চৌধুরী।

রমা বলল,—চলুন অনিরুদ্ধবাবু, ছেলেটির কি হল দেখে আসি।

রমা ও অনিরুদ্ধ হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হল।

বত্রিশ

বাড়ী ফিরে খাঁচায়-বদ্ধ সিংহের মত গর্জাতে লাগল মিঃ চৌধুরী। অস্থির পদে নিজের ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করতে লাগল। অপমানের জ্বালা তার সর্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিক-দংশনের মত হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। রমা অনিরুদ্ধকে ভালবাসে, একথা এতদিন শুধু সন্দেহ করে এসেছে মিঃ চৌধুরী। আজ আর সন্দেহ নয়, এ সত্য বুঝতে পেরেছে সে। অনিরুদ্ধের সামনে রমা আজ তাকে অপমান করেছে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে চাপাকণ্ঠে বারবার অনিরুদ্ধের নাম উচ্চারণ করতে লাগল মিঃ চৌধুরী।

চিৎকার করে চাকরকে ডাকল,—রামদীন, রামদীন ?

প্রভুর উচ্চকণ্ঠে সচকিত হয়ে শীর্ণকায় রামদীন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উপস্থিত হল মিঃ চৌধুরীর সামনে

—রামদীন, তোকে আমি জেল থেকে বাঁচিয়েছিলাম, মনে আছে ?

—জী, হাঁ। আমি আপনার গোলাম।

—তুই আমার একটা উপকার করতে পারবি ?

—আমি আপনার জন্য জান দিতে পারি সাহেব।

—না তোকে প্রাণ দিতে হবেনা, প্রাণ নিতে হবে। পারবি ?

মিঃ চৌধুরীর কথা শুনে আর তার চেহারা দেখে শিউরে উঠল রামদীন।

আস্তে আস্তে বলল,—আপনার হুকুমে আমি সব করতে পারি সাহেব।

—আচ্ছা। তোকে কি করতে হবে পরে বলব, এখন যা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল রামদান।

পাগলের মত জোরে হেসে উঠল মিঃ চৌধুরী। তারপর আলমারি থেকে মদের বোতল বের করে অনেকটা মদ গেলাসে ঢেলে ফেলল। কিছুটা মদ্য পান করে টেবিলের ওপর রক্ষিত ফটো ষ্ট্যাণ্ড সুদ্ধ রমার ফটোটা হাতে নিযে দেখতে লাগল। ফটোটাকে উদ্দেশ্য করে খেদের সুরে মাতালের মত বলল,—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে, মোরে হে সুন্দরী।' তোমার জন্যে অনেক সয়েছি। বিদেশী নীল-নয়নাদের হৃদয়জয়ী কনক চৌধুরীকে তুমি তাচ্ছিল্য করেছ। অপমান করেছ' তবুও তোমার আকর্ষণ আমায় পাগল করে। দুর্বল কনক চৌধুরীকে তুমি দেখেছ, কঠোর কনক চৌধুরীকে চেননি। এবার তার পরিচয় তুমি পাবে। না, আর নয়! তোমার দম্ভকে আমি পায়ের নীচে লুটিয়ে দেব। অনিরুদ্ধের জন্যে তুমি কাঁদবে, আমি দেখে হাসব।

আবার জোরে হেসে উঠল সে। হাসি থামলে মদের গেলাস মুখের কাছে তুলে ধরল। ফটোটা টেবিলের ওপর রেখে দিল।

তেত্রিশ

বাড়ী ফিরে দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে ছেলেটির বাবা ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আরও দু'চারজন লোক ছিল। হাসপাতালে গিয়ে অনিরুদ্ধ আর রমাকে দেখে সঙ্গের লোকগুলো তাদের চিনতে পারল। অনিরুদ্ধকে তারা প্রশ্ন করল,—ছেলেটি কোথায় ? কেমন আছে ?

অনিরুদ্ধ বলল,—ছেলেটির পা কেটে ফেলতে হয়েছে। তবে বেঁচে যাবে, ভয় নেই।

অনিরুদ্ধের কথা শুনে ছেলেটির বাবা ডুকরে কেঁদে উঠল। সঙ্গের একজন লোক অনিরুদ্ধকে জানাল, ও ছেলেটির বাবা।

অনিরুদ্ধ তখন ছেলেটির বাবাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগল। তার আগ্রহাতিশয্যে অনিরুদ্ধ ডাক্তারকে ব'লে তাকে ছেলেটির বেডের কাছে নিয়ে গেল। লোকটিকে চিৎকার করে কাঁদতে নিষেধ করল ডাক্তার।

অজ্ঞান অবস্থায় ছেলেটি পড়ে ছিল। ছেলেকে দেখে তার বাবা কি চুপ করে থাকতে পারে ? আবার সে ডুকরে কেঁদে উঠল। অনিরুদ্ধ তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বাইরে নিয়ে এল।

তারপর একটি ট্যাক্সি ডেকে অনিরুদ্ধ ও রমা লোকটিকে আর সঙ্গী কয়জনকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিল।

ভবানীপুরের একটি বস্তিতে থাকে লোকটি। আহত ছেলেটিই তার একমাত্র সন্তান। লোকটি মোটরের কারখানায় কাজ করে। লোকটিকে ফিরে আসতে দেখে, তার স্ত্রী আকাশ-বিদীর্ণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। রমা ছেলেটির মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—তোমার ছেলে ভাল হয়ে ঘরে ফিরে আসবে। কেঁদনা। ভগবানকে ডাক, তিনি যেন মঙ্গল করেন।

মায়ের মন সান্ত্বনায় বাঁধ মানেনা। প্রতিবেশী মেয়েরাও তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

আবার পরের দিন তারা আসবে বলে, রমা আর অনিরুদ্ধ বিদায় নিল।

রমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে বসে অনিরুদ্ধ বলল,—চলুন, আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। ড্রাইভার, মুলেন ষ্ট্রীটে চল।

কিছু পরে রমা প্রশ্ন করল,—ছেলেটি যদি না বাঁচে অনিরুদ্ধবাবু?

—তাতে আর এমন কি ক্ষতি হবে। সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ হয়ত দিতে হবে মিঃ চৌধুরীকে। অবশ্য ওরা যদি কেস করে।

—আমি ওর বাপ-মায়ের কথা ভাবছি।

—ভেবে কি লাভ? এ দৃশ্য আপনার কাছে নূতন,—কিন্তু এই তো ওদের মত গরীবদের স্বাভাবিক জীবন। বড়লোকদের নিষ্কম্প দম্ভের চাকার তলায় এমনি করে চিরদিন ওদের বুকের রক্ত পিষ্ট হয়ে চলেছে। হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল বোধহয় আমি হাসপাতালে যাবার মোটেই সময় পাব না। যদি পারেন, একটু খোঁজ নেবেন ছেলেটির।

—কাল আপনার কি কাজ?

—বেলঘরিয়ার 'আনন্দময়ী কটন মিলে' গোলমাল চলছে। আজও সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরবার পথেই তো দেখলাম, এই দুর্ঘটনায় আপনারা জড়িয়ে পড়েছেন।

গাড়ী রমাদের বাড়ীর সামনে এসে গিয়েছিল। রমা বলল,— বাঁয়ে রোখো।

গাড়ী থামল।

—আপনিও আসুন অনিরুদ্ধবাবু।

—চলুন, মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই সুযোগে দেখাটা করে যাই।

রমা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ট্যাক্সির ভাড়া দিল।

মহেন্দ্রবাবুর ঘরে অনিরুদ্ধকে পৌঁছিয়ে দিয়ে, রমা বলল,—আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন, আমি আসছি।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—রমার টেলিফোন পেয়ে আমি তো খুব ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। তা, ছেলেটি এখন কেমন আছে?

অনিরুদ্ধ মহেন্দ্রবাবুকে সমস্ত অবস্থা জানাল।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—তা কনক এলনা কেন?

অনিরুদ্ধ বলল,—ওঁর বোধহয় কোন জরুরী কাজ ছিল। হাসপাতাল থেকেই উনি চলে গেছেন।

রমা এক ডিস খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। অনিরুদ্ধকে সে বলল,—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিন।

—এখন আবার এসব কেন?

—সকালে বেলঘরিয়ায় গেছেন। তারপর সারাদিন তো আর খাওয়া হয়নি আপনার। নিন, উঠুন।

—আমি এক্ষুণি বাড়ী গিয়ে স্নান করে নেব। তার আগে তো কিছু খেতে পারব না রমা দেবী।

—এখানেই স্নানটা সেরে নিন্‌না। আমি বাথরুমে সব ঠিক করে রেখে এসেছি! বাবার জামা বোধহয় আপনার একটু বড় হবে। তা হোক,—চলুন তো।

অনিরুদ্ধের জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল। মহেন্দ্রবাবুও বললেন,—আপনি যান অনিরুদ্ধবাবু, জামা-কাপড় ছেড়ে কিছু মুখে দিন।

—আচ্ছা, চলুন।

রমাকে অনুসরণ করে অনিরুদ্ধ বেরিয়ে গেল।

. .

চা-জলখাবার খেয়ে উঠে পড়ল অনিরুদ্ধ। মহেন্দ্রবাবুকে নমস্কার করে বলল,—আচ্ছা মহেন্দ্রবাবু, আমি এবার চলি।

—আসুন।

প্রতি-নমস্কার করলেন মহেন্দ্রবাবু।

রমাও অনিরুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এল।

আগেই ড্রাইভারকে গাড়ী বের করে রাখতে বলেছিল রমা। রমা আর অনিরুদ্ধ নীচে এলে, ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল।

—একি, আবার গাড়ী কেন?

—তবে কি এত রাত্রে হেঁটে যাবেন?

—তাতে আমার কষ্ট কিছু নেই।

—অপ্রয়োজনে কষ্ট স্বীকার করবারও কোন মানে হয় না অনিরুদ্ধবাবু!

হেসে অনিরুদ্ধ বলল,—আজ আপনার যাবতীয় আতিথ্যই আমি গ্রহণ করলাম রমা দেবী।

গাড়ীতে উঠে বসল অনিরুদ্ধ।

—কাল কিন্তু হাসপাতালে ছেলেটির খোঁজ নেবেন।

—আপনার বার বার সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

হেসে ফেলে অনিরুদ্ধ বলল,—আচ্ছা।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

চৌত্রিশ

'আনন্দময়ী কটন মিলস্' এর মালিক অনাদিভূষণ লাহিড়ী। সীতার শ্বশুর। মিলের ম্যানেজারটি লোক ভাল নয়। মিলের কর্মীদের সাথে তার ব্যবহার ভাল তো নয়ই, উপরন্তু লোকটি চরিত্রহীন। ম্যানেজার অবিবাহিত, মিলস্ কোয়ার্টারেই একা থাকে।

গোলমালের সূত্রপাত হয় ঐ ম্যানেজারকে নিয়েই। ম্যানেজার কোন একজন কর্মীকে তার ঘরে তলব করে নিয়ে গিয়ে বলে, তার কাজে আজকাল প্রায়ই গাফিলতি হচ্ছে। ঠিকমত কাজ না করলে, তার কাজ থাকবেনা।

কর্মীটি জানত যে ম্যানেজারকে সে তোষামোদ করে চলেনা বলে, ম্যানেজার তার উপর সন্তুষ্ট নয়। তার কাজের কি ত্রুটি হচ্ছে ম্যানেজারের কাছে সে জানতে চায়।

এতেই ম্যানেজার ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গালাগালি দেয়। কর্মীটি যে ম্যানেজারের মুখের ওপর কথা বলেছে, এই তার অপরাধ।

অনর্থক গালাগালি খেয়ে, কর্মীটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও ম্যানেজারকে গালাগালি করতে নিষেধ করে।

ম্যানেজারের ঘরে গোলমাল শুনে, বেয়ারা ঘরে ঢুকে পড়ে। ম্যানেজার বেয়ারাকে বলে, কর্মীটিকে ঘর থেকে বের করে দিতে। বেয়ারা কর্মীটির হাত ধরতেই, সে ধাক্কা দিয়ে বেয়ারাকে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এরপর ম্যানেজার কর্মীটির বরখাস্তের নোটিশ দেয়।

ম্যানেজারের ওপর অসন্তোষ বহুদিন থেকে ধূমায়িত হচ্ছিল। এই ব্যাপারে সে অসন্তোষ একেবারে ফেটে পড়ল।

বরখাস্ত কর্মীটির জায়গায় নূতন যে লোকটিকে নেওয়া হল, সে ম্যানেজারের অনুগৃহীতা একটি ছোটঘরের বিধবা যুবতীর ভাই। ঐ লোকটিকে চাকরি দেবার জন্যেই যে কর্মীটিকে সরানো হয়েছে— এ কথা সবারই ধারণা হল।

এই ব্যাপারে মিলের কর্মীরা একজোট হয়ে ধর্মঘট করবে স্থির করল। মিলে গোলমালের খবর পেয়ে, মালিক অনাদিভূষণ নিজে একদিন মিলে এলেন।

সমস্ত কর্মীর মুখপাত্র হয়ে কেষ্ট সামন্ত ব'লে একজন পুরোনো হেড মিস্ত্রী মালিককে তাদের কথা জানাল। কর্মীদের অনুরোধ, মালিক যেন ম্যানেজারের এই যথেচ্ছাচারের সঠিক তদন্ত করেন। তদন্তে কর্মীটির কোন দোষ প্রমাণিত না হলে, তাকে পুনরায় বহাল করতে হবে। আর ম্যানেজার দোষী প্রমাণিত হলে, তাকে বরখাস্ত করতে হবে। যতদিন তদন্ত চলবে, ম্যানেজার যেন মিলে কাজে না আসে।

কর্মীদের দাবি শুনে মালিক কথা দিলেন যে, তিনি তদন্ত করবেন। তদন্তে যদি কর্মীটির দোষ না পাওয়া যায়, তবে তাকে পুনরায় কাজে নেওয়া হবে। ম্যানেজারের সম্বন্ধে সর্ত দু'টোর কোন উল্লেখ করলেন না মালিক। উপরন্তু, বললেন, কাজে কোন গাফিলতি বরদাস্ত করবেন না। ঠিকমত প্রোডাকসন তুলে না দিলে তিনি কর্মীদের কোন কথা শুনতে প্রস্তুত থাকবেন না বলে, শাসিয়ে গেলেন।

মালিক চলে গেলে, কর্মীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। এখন তাদের কি করা উচিৎ তারা বুঝে উঠতে পারল না। ঠিক এই সময় খবর পেয়ে অনিরুদ্ধ মিলের কর্মীদের সাথে দেখা করে। অনিরুদ্ধকে পেয়ে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল। অনিরুদ্ধকে তারা তাদের নেতা বলে মেনে নিল। আর অনিরুদ্ধের সম্বন্ধে তাদের সবচেয়ে বেশী যে আশ্বাস দিল, সে পরাণ মণ্ডল। পরাণ মণ্ডলকেই বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরাণ অনিরুদ্ধকে চিনল। অনিরুদ্ধও তাকে চিনতে পারল। পরাণ সবাইকে বলল, অনিরুদ্ধ তাদের গাঁয়ে গিয়ে কি ভাবে কষ্ট সহ্য করে সবাইকে সেবা করেছিল।

সমস্ত শুনে অনিরুদ্ধ বলল,—তোমরা মালিককে যা বলেছ, ঠিকই বলেছ। তোমাদের সর্ত মালিককে মেনে নিতেই হবে। লিখিতভাবে তোমাদের সর্ত মালিককে জানাতে হবে।

সব কর্মীদের দিয়ে সই করিয়ে মালিককে একখানা চিঠি পাঠান হল যে, তাদের সব সর্ত মেনে না নিলে তারা ধর্মঘট করবে। উত্তরের জন্যে মালিককে দু'দিনের সময় দেওয়া হল। মালিকের চিঠিখানা পিয়ন বইতে লিখে ম্যানেজারের সই নিয়ে, তাকেই দেওয়া হল।

চিঠির মর্মার্থ টেলিফোনে ম্যানেজার মালিককে জানাল। আরও জানাল যে, কলকাতা থেকে অনিরুদ্ধ চৌধুরী নামে একজন এসে লোকগুলোকে যুক্তি দিচ্ছে।

ম্যানেজার তার চর মারফৎ সব খবরই পাচ্ছিল।

পরে ম্যানেজারকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেবেন বলে, ফোন ছেড়ে দিলেন অনাদিভূষণ।

অনিরুদ্ধের নাম শুনে অনাদিভূষণের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। গিন্নীকে তিনি ডেকে পাঠালেন।

গিন্নী ঘরে ঢুকতে, তাঁকে বললেন,—খোকা বাড়ীতে আছে ?

—বোধহয় আছে।

—বৌমা কোথায় ?

—এতক্ষণ আমাকে গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল। সত্যি, লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে কি হয়, বৌমা আমার খুব ভাল। একখানা ইংরেজী বই থেকে কত সুন্দর সব গল্প বলে আমাকে শোনাচ্ছিল।

—রামায়ণ-মহাভারত ছেড়ে, তুমি আজকাল বৌমার কাছে ইংরেজী নভেলের গল্প শুনছ ?

—নভেল না গো! কি সুন্দর সব ধর্মের কথা। আমাদের বুদ্ধ, চৈতন্যের মত ওদের দেশেও ধার্মিকেরা কত যে সহ্য করেছে—সে সব কিছুই জানতাম না আমি।

—তা, ভাল। কিন্তু বৌমার ভাইটি যে আমাদের পেছনে লেগেছে।

— সে কি কথা গো! সে তো তেমন ছেলে নয়।

—আমাদের মিলে যে গোলমাল চলছে এইমাত্র ম্যানেজার ফোন করে জানাল, অনিরুদ্ধই নাকি লোকগুলোকে খেপাচ্ছে।

—তা বাপু, তোমাদের ম্যানেজার লোকটি যে একেবারে নির্দোষ তা আমার বিশ্বাস হয় না।

—সে কথা থাক। তার দোষ থাকলেও আমাকে এখন তা ঢেকে চলতে হবে। তা না হলে, ঐ লোকগুলোর কথামত ম্যানেজারকে সাজা দিলে, ভবিষ্যতে কোনদিন আর ঐ লোকগুলো দিয়ে কাজ পাওয়া যাবেনা। তারা সব মাথায় চড়ে বসবে। কথায় কথায় নিত্য নূতন বায়না ধরবে।

—তা বাপু, আমাকে ডেকেছ কেন? এ সব নিয়ে বৌমাকে কিছু বলা চলবেনা।

—না না, বৌমাকে বলবে কেন? তবে ভাইটিকে বৌমা যেন বুঝিয়ে বলে। আত্মীয়ের মধ্যে এরকম বিবাদ করা কি ভাল?

—কি জানি বাপু! আচ্ছা বলব বৌমাকে।

—আজ বিকেলেই বৌমা একবার ওবাড়ী থেকে ঘুরে আসতে পারে।

—আজই?

—হ্যাঁ। অনিরুদ্ধের পরামর্শে তারা আমাকে দু'দিনের সময় দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। অনিরুদ্ধ সরে দাঁড়ালে, সব গোলমাল আমি অনায়াসে মিটিয়ে দিতে পারব।

—অনিরুদ্ধকে তুমি ভয় কর?

—ভয় নয়। এ তুমি ঠিক বুঝবে না। এ হচ্ছে বুদ্ধির খেলা। অনিরুদ্ধ সরে না দাঁড়ালে, আমাকে অন্য মতলব করতে হবে। যাও, তুমি বৌমাকে বুঝিয়ে ওবাড়ী পাঠিয়ে দাও। খোকা সঙ্গে যাক। ওরা ফিরলেই, আমাকে জানাবে।

গিন্নী কর্তার ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের ঘরের সামনে এসে ডাকলেন,—ও বৌমা, খোকা আছে?

ছেলে-বউ ঘরেই ছিল! প্রবীর বলল,—এস, মা।

সীতা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, গিন্নী বললেন,- তুমি যেওনা বৌমা। খোকা, আমি এখন কি করি বলত?

—কি হয়েছে মা?

—কর্তা আমাকে এই মাত্র ডেকে বললেন,—আমাদের মিলে যে গোলমাল হচ্ছে, অনিরুদ্ধই নাকি তাদের পেছনে থেকে যুক্তি দিচ্ছে। অনিরুদ্ধের কি উচিৎ, আমাদের সাথে বিবাদ করা?

মায়ের কথা শুনে প্রবীর একবার সীতার মুখের দিকে তাকাল।

সীতা বলল,—আমি তো এর কিছু জানিনা মা।

—না বৌমা, তুমি আর কোত্থেকে জানবে। কর্তা শুনে দুঃখ করছিলেন। অনিরুদ্ধকে উনি স্নেহ করেন। বলছিলেন, বৌমা যেন অনিরুদ্ধকে বলে, এসবের মধ্যে থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে।

—বাবা হয়ত দাদাকে ভুল বুঝেছেন। দাদা তো অন্যায় কিছু করে না। আচ্ছা, আজ আমি দাদার সঙ্গে দেখা করে জেনে আসব, সত্যই কি ব্যাপার!

—তাই যেয়ো বৌমা। খোকা, বৌমাকে তুই নিয়ে যাস বিকেলে। শুনে পর্যন্ত আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

গিন্নী বেরিয়ে গেলেন।

—তোমার কি মনে হয়, দাদা অনর্থক গোলমাল সৃষ্টি করেছে?

—দেখ সীতা, আমি রাজনীতি বুঝিনা। আর মিল চালানো, সেও আমার কর্ম নয়! তবে ব্যাপারটা যা গড়িয়েছে, বড় গোলমেলে ঠেকেছে। চল তো বিকেলে, সত্যি ব্যাপারটা দাদার কাছে জেনে নেওয়া যাবে।

প্রবীর আর সীতা যখন এল, অনিরুদ্ধ বাড়ী ছিল না। কমলা সাদরে মেয়ে-জামাইকে অভ্যর্থনা করল।

সীতা জিজ্ঞাসা করল,—দাদা কখন ফিরবে ছোটমা? কোথায় গেছে জান?

—সব কথা তো আমাকে বলে না ভাই। তবে বলে গেছে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। কাল ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। আজ তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছি।

—কাল রাত হল কেন?

—বেলঘরিয়া থেকে ফেরবার পথে এক মোটর অ্যাকসিডেণ্টে জড়িয়ে পড়েছিল। একটি ছোট ছেলে মোটর চাপা পড়েছিল। তাকে হাসপাতালে দিয়ে, রমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে ফিরেছিল।

—রমা কি সব সময়েই দাদার সঙ্গে ঘোরে নাকি ?

—তা জানিনে, তবে তারই মোটরের তলায় চাপা পড়েছিল ছেলেটি। ভাবী স্বামীর সঙ্গে মোটরে বেড়াচ্ছিল রমা। মোটর চাপা দিয়ে সে বিপদে পড়েছিল। হঠাৎ সেই সময় তোর দাদা সেখানে গিয়ে পড়ে। তারপর তাকেই সব করতে হয়।

—কেন, তার ভাবী স্বামী কি করছিল ?

—লোকটা নাকি একদম ক্রুট। তোর দাদার সামনেই রমার সাথে তার নাকি ঝগড়া হয়ে গেছে।

—রমার সব তাতেই আদিখ্যেতা! দাদার কাছে ভাল হওয়ার জন্যে কি রকম আপ্রাণ কাজ করল—দেখেছ তো। দাদা তো এখন রমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রমা বোধহয় দাদাকে গুণ করেছে। যাক গে,—বেলঘরিয়ার কথা কিছু বলেনি দাদা ?

—কেন, তুই জানিস নে ? তোদের মিলে নাকি গোলমাল চলছে। তোর দাদা বলছিল, নিজেকে সে এর মধ্যে জড়াতে চায়নি। কিন্তু লোকগুলো তোর দাদাকে আঁকড়ে ধরল। তারা তো জানে না, মিলের মালিক তোর দাদার বিশেষ আত্মীয় ? তবে যতটুকু শুনে বুঝলাম, মিলের ম্যানেজারটিই নাকি গোলমালের মূল। লোকটি অত্যাচারী আর চরিত্রহীন। আচ্ছা, তোরা বস—আমি আসছি।

কমলা চলে যেতেই সীতা বলল,—শুনলে তো ?

—বাবা হয়ত ম্যানেজারটি সম্বন্ধে কিছু জানেন না।

অনিরুদ্ধ বাড়ী ফিরেই প্রথমে সারদার কাছে সীতাদের আসার খবর পেল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অনিরুদ্ধ বলল,—কিরে, তোরা কতক্ষণ ?

সীতা অনিরুদ্ধকে প্রণাম করল। প্রবীরও প্রণাম করবার জন্যে নত হতে অনিরুদ্ধ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল,—থাক ভাই। তুমি বস।

সীতা বলল,—তুমি কি বেলঘরিয়া থেকে ফিরছ দাদা?

সীতার প্রশ্নে অনিরুদ্ধ একটু বিস্মিত হল। বলল,—হ্যাঁরে, সেখান থেকেই আসছি।

—তুমি এ মিলের গোলমাল থেকে সরে দাঁড়াও দাদা।

সীতার কথার উত্তর না দিয়ে প্রবীরকে বলল অনিরুদ্ধ—প্রবীর, তুমি এসে ভালই করেছ। সীতার কথায় বুঝতে পারছি, তোমরা আমায় ভুল বুঝেছ।

—না দাদা, ভুল আমি বুঝিনি। বাবা মিল দেখেন। মিলের গোলমালের মধ্যে আপনি আছেন জেনে, তিনি দুঃখিত হয়েছেন।

—প্রবীর, অনর্থক শ্রমিক শ্রেণীকে উত্তেজিত করে নিজের প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা আমার নেই। মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে সহযোগীতা না থাকলে দেশ শিল্পসমৃদ্ধ হতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে সহযোগীতার ভাব জাগানোই আমার উদ্দেশ্য। আমার প্রচেষ্টা গঠনমূলক। তোমাদের মিলের শ্রমিকেরা অসন্তুষ্ট। উনি যদি মনে করেন, আমি সরে দাঁড়ালেই সব মিটে যাবে, তবে উনি ভুল বুঝেছেন। ওদের মনে দিনের পর দিন অসন্তোষের ইন্ধন জুগিয়েছে ম্যানেজারটি,—আজ একটা অজুহাতে ওরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিকারের সবল দাবি নিয়ে। কোন গোঁজামিল দিয়ে, এ অসন্তোষের আগুন নেবানো যাবে বলে তো আমি মনে করি না আমি তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাইনি ভাই। বিশ্বাস কর, তোমাদের সত্যিকারের মঙ্গল কামনাই আমি করি।

—ওরা কি চায়?

—ওদের সর্তগুলো তোমার বাবা মেনে নেননি। তদন্ত চলাকালীন ম্যানেজারকে ছুটিও তো উনি দিতে পারেন?

কমলা ঘরে ঢুকে বলল,—প্রবীর ওঠ। অনিরুদ্ধ তুমিও ওঠ, তোমারও খাবার দিয়েছি।

—তোমরা যাও প্রবীর। আমি স্নানটা সেরে আসছি।

অনিরুদ্ধ তোয়ালে আর একখানা কাপড় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সীতা বলল,—দাদা বুঝি না খেয়েই গিয়েছিল ছোটমা?

—রোজই তো প্রায় এমনি চলেছে।

প্রবীর বলল,—ছিঃ, ছিঃ, আগে জানলে, ওঁর সঙ্গে পরে কথা বলতাম।

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সীতা বলল,—পরের জন্যে এমনি করেই দাদা জীবনটা দেবে।

কমলা বলল,—তোমরা চল প্রবীর।

প্রবীর বলল,—উনি অসুন।

—সীতা তুই তবে অনিরুদ্ধ আব প্রবীরকে নিয়ে আয়। আমি ওদিকে দেখি।

কমলা চলে গেল।

সীতা বলল,—তোমরা শুধু নিজের স্বার্থই দেখছ। আর দাদা কোন স্বার্থে সর্বত্যাগী, সন্ন্যাসী হয়ে পরের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে?

—ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা করে, আমাকে শুধু লজ্জা দিচ্ছ সীতা।

তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকে বলল,—তোরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিস নাকি?

অনিরুদ্ধের কথায় উত্তর দিলনা কেউ।

আয়নার সমানে দাঁড়িয়ে মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে অনিরুদ্ধ বলল,—আচ্ছা সীতা, ছোটমার কি এটা অন্যায় নয়? আমি কখন ফিরি না ফিরি ঠিক নেই, ছোটমা কেন না খেয়ে বসে থাকেন? আমি কতদিন ওঁকে খেয়ে নেবার জন্যে বলেছি, কিন্তু আমার কথা উনি শোনেন না।

—তুমি যদি জান দাদা যে, তুমি না খেলে ছোটমা খায়না, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলেই তো পার।

—চেষ্টা তো করি বোন, কিন্তু সব দিন তাড়াতাড়ি ফেরা যায়না। নে চল। চল প্রবীর।

সবাই ঘর থেকে বেরুল।

প্রবীর ও সীতা চলে গেলে, অনিরুদ্ধ কমলাকে বলল,—আমি একটু বেরুচ্ছি।

—এখন অবার কোথায় যাচ্ছ ?

—এই মোড়ের মাথায়। রমা দেবীকে একটা ফোন করতে হবে। ছেলেটি কেমন আছে আজ, জেনে আসি। বেশী দেরি হবে না। আমি এখ্খুনি আসছি।

অনিরুদ্ধ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। বড়রাস্তায় একটি দোকান থেকে রমাকে ফোন করে জানল, ছেলেটির জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার বলেছে, আর ভয়ের কারণ নেই। তবে বেশ কিছুদিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

পঁয়ত্রিশ

পরদিন সকালেই অনাদিভূষণের প্রকাণ্ড ঝকঝকে গাড়ী এসে দাঁড়াল অনিরুদ্ধের বাড়ীর দরজায়। ড্রাইভারের হাতে চিঠি দিয়ে অনিরুদ্ধকে ডেকে পাঠিয়েছেন অনাদিভূষণ।

চিঠি পড়ে অনিরুদ্ধ ড্রাইভারকে বলল,—তুমি গাড়ীতে গিয়ে বস। আমি যাচ্ছি।

বিশেষ সমাদরে আত্মীয়ের মতই অনিরুদ্ধকে গ্রহণ করলেন আনাদিভূষণ।

অনাবশ্যক কথা এড়িয়ে অনাদিভূষণ বললেন,—প্রবীরের মুখে কাল আমি সব শুনেছি। ম্যানেজারকে আমি ছুটি দেব। তুমি তো তাইই চাও।

—যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমার মনে হয় ম্যানেজারকে ছুটি দেওয়া ভালই হবে। আর, প্রবীরকে কাল আমি সবই বলেছি, আশাকরি, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

—না, না, ঠিকই বলেছ তুমি। আমি সব খবর তো ঠিক পাইনা। তাই কে দোষী, কে নির্দোষ বুঝতে পারিনা। হ্যাঁ, তোমাকে ডেকেছি এই জন্যে যে, তুমি ওদের জানিয়ে দাও, আমি তদন্ত করব। বিচারও করব। উচিৎ বিচারই আমি করব। কিন্তু মিলের কাজে কর্মিরা কোন গাফিলতি করবে না, এ নিশ্চয়তা আমি চাই।

—বেশ, আপনার কথা তাদের জানাব। আর তাদের উত্তরও আজ বিকেলের মধ্যে আপনাকে জানাব।

—আর একটা কথা। অবশ্য, এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, আত্মীয়। তোমাকে বলতে দোষ নেই। প্রবীর সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়েছি। আমার অবর্তমানে এ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবীর হয়ত টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেনা। তাই এ বিষয়ে তোমার সাহায্য আমি চাচ্ছি। তোমার আদর্শের কথা আমি জেনেছি, আর আমিও ঠিক তাই চাই। দেশকে শিল্প-সমৃদ্ধ করতে গেলে, এ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে বেঁচে থাকে, সে চেষ্টা তো করতে হবে। তাই আমি বলি, আমার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তুমি যোগ দাও। তুমি কিছু শেয়ার কেন।

অনিরুদ্ধ বলল,—আমার আদর্শের সঙ্গে আপনার আদর্শের হয়ত গরমিল নেই। তবে আমাদের দু'জনের কর্মের প্রভেদ রয়েছে। আমার কাজ শিল্পপতি আর শ্রমিকের মধ্যে পরস্পর-নির্ভরশীলতার ভাব জাগানো। এ ভাব যত ব্যাপক হবে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। আজ আমি নিজে যদি শিল্পপতির দলে নাম লেখাই, শ্রমিকেরা আমাকে সহজে আর বিশ্বাস করতে পারবেনা। সুতরাং আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আচ্ছা, আজ আমি উঠি।

প্রবীরের মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,—সে কি বাবা, এর মধ্যেই যাবে কি! চল, বৌমা তোমার খাবার নিয়ে বসে আছে।

—চলুন, সীতার সঙ্গে দেখা করে যাই।

গিন্নীর সঙ্গে অনিরুদ্ধ বেরিয়ে গেল।

মালিক যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আর তাদেব সর্ত মেনে নিয়েছেন, সবাইকে জানাল অনিরুদ্ধ। কর্মীরা কথা দিল, তারাও কোম্পানীর কাজ উঠিয়ে দেবে।

অনিরুদ্ধ বলল,—আজ ম্যানেজার কাজে আসেনি। এ থেকেই বুঝতে পারছ তোমরা, মালিক তাঁর কথা বেখেছেন।

একজন প্রশ্ন করল,—নূতন ম্যানেজার কে হবে?

অনিরুদ্ধ বলল,—তা জানিনা। মালিক ঠিক করবেন। তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথাও নেই। কাল থেকে যাতে পরাণের ব্যাপারে তদন্ত সুরু হয়, আমি মালিককে তা জানাব। তোমবা এখন সব কাজে যাও।

সবাই চলে গেল। একমাত্র পরাণ মণ্ডল বসে রইল।

অনিরুদ্ধ বলল,—পরাণ এ ক'দিন তোমাব কথা কিছুই শোনবার সময় পাইনি। তোমাকে যে এখানে এভাবে আবার দেখব, ভাবিনি। আমি তো প্রথমে আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলাম।

—জগতে কত আশ্চর্য ঘটনাই তো ঘটে দাদাবাবু!

—প্রসাদী ভাল আছে তো?

অবাক হয়ে অনিরুদ্ধের দিকে তাকাল পরাণ।

অনিরুদ্ধ বলল,—নায়েব মশায়ের সঙ্গে কলকাতায় আমার একবার দেখা হয়েছিল। উনি তো প্রায়ই কলকাতায় আসেন। তোমার আর প্রসাদীর কলকাতায় আসার কথা তাঁর মুখেই আমি শুনেছি।

—হ্যাঁ, শুনিছেন ঠিকই। তয় পেসাদী আমার কাছে নাই।

—কেন ? সে তবে কোথায় ?

—তা কি করে জানব দাদাবাবু! শিয়ালদহ ষ্টেশনে পেসাদীকে রাখ্যা ঘর খুঁজতি গিছিল্যাম। রাস্তায় রাস্তায় সারাদিন ধর‍্যা ঘর খুঁজ্যা ফিরে আসতিছিলাম। হঠাৎ শুনল্যাম 'চোর' 'চোর' শব্দ—একটা গোলমাল। লোক ছুটতিছিল। আমি দাঁড়াল্যাম। শেষে একটা লোক আমাকই ধর‍্যা বলল,—এই ব্যাটা চোর। আমি তো অবাক। সঙ্গে সঙ্গে আমার চারিদিক ভিড় জমে গেল। একটা লোক চড় মারল আমাক। শুধ্যা শুধ্যা মার খ্যায়া রক্ত গরম হয়্যা উঠল আমার। আমিও এক কিল উঠ্যালাম। পাহারাওয়ালা আস্যা আমার হাত চাপ্যা ধরল। তারপর আমাক থানায় নিয়্যা চলল। সে রাত থানায় রাখ্যা, দারোগা আমাক ছাড়্যা দিল। দারোগা বিশ্বাস করিছিল, আমি চোর না। পরদিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে ফির‍্যা দেখল্যাম, পেসাদি নাই। নাই তো নাই। তারপর কত যে খুঁজিচি, তা আর কি কব দাদাবাবু!

একটু চুপ করে থেকে পরাণ বলল,—পেসাদিকে নিয়্যা ঘর বাঁধব, কত আশা নিয়্যা কলকাতায় আইছিল্যাম। পেসাদি আমার বিয়ে করা বউ—কিন্তুক তাক নিয়্যা ঘর বাঁধা আর আমার হলনা। পেসাদিকে ভালবাস্যা সারা জীবনটা শুধু দুঃখই পাল্যাম দাদাবাবু!

অনিরুদ্ধ বলল,—প্রসাদীও হয়ত কোথায়ও কত দুঃখে দিন কাটাচ্ছে, কে জানে!

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পরাণ বলল,—কি জানি! যদি জানত্যাম সে সুখে আছে, তবুও খানিক শান্তি পাত্যাম।

অনিরুদ্ধ বলল,—আমি কালকেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। সব রকম চেষ্টা করে দেখব, প্রসাদীকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

—পেসাদি বড় ভাল মিয়ে দাদাবাবু। আপনি তো তাক জানেন শুধ্যা বুড়া মোড়ল বাধা না দিলি, সে এতদিন আমার ঘর আলো কর‍্যা থাকত। আর আমিও এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়্যা বেড়াতাম না।

—আমি মোড়লের কাছে সব শুনেছি পরাণ। তুমি যদি নায়েবের দলে না ভিড়তে, তবে মোড়ল তোমার ওপর রাগ করত না।

—সে অনেক কথা দাদাবাবু। ঐ পেসাদিকে ঘরে আনব্যার জন্যিই আমি চুরি কর‍্যা জেলে গিছিল্যাম। জেল থিক্যা ফির‍্যা দেখল্যাম, ঘেন্নায় মা আত্মহত্যা করিছে। সগ্গলে আমাক একঘরে করিছে। বুড়্যা মোড়লও অপমান কর‍্যা তাড়ায়ে দিল। আমি তো আশ্রয়ের জন্যে মোড়লের কাছেই গিছিল্যাম। সে যদি আমাক তাড়ায়ে না দিত, তবে কি নাড়ি মশায়ের কাছে আমি যাত্যাম?

—তুমি মন খারাপ করোনা পরাণ। প্রসাদীর খোঁজ করবার সব রকম চেষ্টা আমি করব। আচ্ছা, আজ যাই!

—চলেন, ষ্টেশনে আগায়ে দিয়ে আসি আপনাক।

—না, না, তুমি আর অতদূরে কষ্ট করে কেন যাবে?

অনিরুদ্ধের সাথে গল্প করতে করতে পরাণ কিছুদূর পর্যন্ত তার সঙ্গে এল।

অনিরুদ্ধ বলল,—এবার তুমি ফিরে যাও পরাণ। অনেকটা তুমি এসে পড়েছ।

—আপনি কাল আসবেন?

—হ্যাঁ। কাল আসব।

পরাণ ফিরল। অনিরুদ্ধ এগিয়ে চলল।

সন্ধ্যা না হলেও সূর্য তখন ডুবে গেছে। রাস্তার দু'পাশে ঝোপ জঙ্গল। অনিরুদ্ধ ট্রেণ ধরবার জন্যে বেশ জোরেই হেঁটে আসছিল। হঠাৎ একটি লোক ঝোপ থেকে বেরিয়ে পেছন থেকে অনিরুদ্ধের মাথায় লাঠি মারল। একটা কাতর শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল অনিরুদ্ধ।

পরাণ তখনও বেশীদূর যায়নি। অনিরুদ্ধের কাতর শব্দ সে শুনতে পেল। পরাণ তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে এল। দূর থেকে দেখল,

একটা লোক লাঠি হাতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। আর, অনিরুদ্ধ রাস্তায় পড়ে রয়েছে। পরাণ লোকটিকে ধরবার জন্যে অতি দ্রুত তার পশ্চাদ্ধাবন করল। লোকটি খোঁড়া। বেশী জোরে চলতে পারেনা। পরাণ অবিলম্বে তার নাগাল পেল। লোকটি ফিরে দাঁড়িয়ে পরাণের মস্তক লক্ষ্য করে লাঠি উত্তোলন করল। ক্ষিপ্রহস্তে তার উদ্যত লাঠি ধরে ফেলল পরাণ। পাড়াগাঁয়ের লাঠিয়াল পরাণের সঙ্গে লোকটি পারবে কেন? পরাণ জুজুৎসুর কায়দায় লোকটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার ওপর চড়ে বসল। তারপর চলল দু'জনে ধস্তাধস্তি।

ইতিমধ্যে আরও দু'জন লোক তাদের ধস্তাধস্তির শব্দে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা পরাণের পরিচিত।

—কি পরাণ কি ব্যাপার ?

পরাণ লোকটিকে বেকায়দায় ফেলে কোমড় থেকে গামছা খুলে তাকে বাঁধতে বাঁধতে বলল,—এই লোকটা অনিরুদ্ধবাবুকে খুন করিছে। দাদাবাবু, রাস্তায় পড়্যা আছে।

পরাণের কথা শুনে একজন বলল,—বাঁধো ব্যাটাকে, পিছমোড়া দিয়ে বাঁধ। দাঁড়াও পা-দুটো আমি বেঁধে দিই।

লোকটির পাও বাঁধা হল। পরাণ বলল,—তোমরা এখানে থাক। এ যেন না পালাতে পারে! আমি দাদাবাবুর কাছে যাচ্ছি।

অনিরুদ্ধকে আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে, পথচারী দু'চারজন সেখানে ভিড় জমিয়েছে। পরাণ আসতেই ব্যাপারটা সবাই জানতে পারল।

অনিরুদ্ধ তখন সংজ্ঞাহীন।

পরাণ তাদের একজনকে মিলের শ্রমিক ব্যারাকে খবরটা পৌছিয়ে দিতে বলে, অনিরুদ্ধের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

মিল ম্যানেজার সারাদিন নিজের কোয়ার্টারেই ছিল। অফিসে যেতে তাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন অনাদিভূষণ। অনিরুদ্ধের আহত হওয়ার খবরটা ম্যানেজারও শুনল। আর টেলিফোনে অনাদিভূষণকে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল।

অনাদিভূষণ তাকে অবিলম্বে থানায় ফোন করে সাহায্য চাইতে বললেন। শ্রমিকেরা মিল আক্রমণ করতে পারে।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনাদিভূষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিজেই লালবাজারে টেলিফোন করে আমর্ড গার্ডের জন্যে অনুরোধ জানালেন। বেলঘরিয়ায় পুনরায় টেলিফোন করে জেনে নিলেন, ওখানকার থানা থেকেও পুলিশের সাহায্য ম্যানেজার চেয়ে পাঠিয়েছে।

টেলিফোন শেষ করে অনাদিভূষণ স্ত্রী ও প্রবীরকে ডেকে পাঠালেন। প্রবীর বাড়ী ছিলনা।

গিন্নী ঘরে ঢুকে অনাদিভূষণের গম্ভীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললেন,—কি হয়েছে ?

—বৌমা কোথায় ?

—রেডিয়ো শুনছে। খোকা আজ বাজাচ্ছে কি না !

—এইমাত্র ম্যানেজার টেলিফোন করে জানাল, কে যেন অনিরুদ্ধকে লাঠি মেরেছে।

—এ্যা ! সে কি সব্বনাশের কথা ! কে এমন কাজ করল ? বাছা বেঁচে আছে তো ?

—চেঁচিওনা, বৌমা শুনতে পাবে।

—বাছা বেঁচে আছে কিনা বল ?

—তা জানিনে। এখন কি করব, তাই ভাবছি।

অনাদিভূষণ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। কিছুক্ষণ টেলিফোন শুনে

বললেন,—তা, কিছু করতে হবেনা। যা করবার পুলিশ এসে করুক। মিলের সমস্ত গেটগুলো বন্ধ করে দিয়ে বসে থাক।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে বললেন,—লোকগুলো সব ক্ষেপে গিয়েছে। মিল আক্রমণ করেছে।

—অনিরুদ্ধের খবর কিছু জানতে পারলে ?

—ম্যানেজার তো তার কোয়ার্টার থেকে বেরুতে পারছেনা। খবর সে কিছু আর জানেনা।

—একি হল ? বৌমাকে আমি কি করে বলব !

গিন্নী চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—শোন, শোন—বৌমাকে এখন কিছু বলনা।

স্ত্রীর পেছনে পেছনে এগিয়ে গেলেন অনাদিভূষণ। কিন্তু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সীতা বারান্দা দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

সীতা শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করল,—মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। আপনি আমাকে কি বলতে নিষেধ করছিলেন বাবা ? কি হয়েছে, আমাকে বলুন।

—তুমি যখন শুনেই ফেলেছ বৌমা, তোমাকে বলব। তবে সব কিছু আমিও জানিনা। এইমাত্র ম্যানেজার টেলিফোনে জানাল, অনিরুদ্ধকে কে যেন মাথায় লাঠি মেরেছে। ওখানে খুব গোলমাল হচ্ছে।

এইটুকু শুনেই সীতা বলল,—আমি যাচ্ছি বাবা।

—কোথায়, কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

—মিলে দাদার কাছে।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সীতা।

—সে কি করে হয়, আমি পুলিশে ফোন করে দিয়েছি। তারা সব ব্যবস্থা করছে।

—আমাকে যেতেই হবে বাবা।

অনাদিভূষণের উত্তরের অপেক্ষা না করে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যেতে লাগল সীতা।

—বৌমা!

সীতা ফিরল না। রাস্তায় নেমে একটি ট্যাক্সিতে চড়ে বসল সে। ড্রাইভারকে বলল,—খুব জোরে চালাও, সর্দারজি। বখশিস পাবে। বেলঘরিয়া চল।

সীতা চলে যাবার কিছু পরেই প্রবীর ফিরল বাড়ীতে।

মায়ের মুখে সমস্ত শুনে প্রবীর বলল,—আমিও যাচ্ছি মা।

—কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করে যা খোকা।

—না মা, এখন আর দেরি করবার সময় নেই। বাবাকে তুমি বলো।

প্রবীর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ছত্রিশ

অনিরুদ্ধকে একজনের বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়েছ। স্থানাটিতে লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় একজন ডাক্তার অনিরুদ্ধের চিকিৎসা করছে। অনিরুদ্ধ তখনও সংজ্ঞাহীন।

লোকের মুখে শুনে শুনে সীতা এসে উপস্থিত হল সেখানে। সীতা নিজেকে অনিরুদ্ধের বোন বলে পরিচয় দিতে, সকলে তার পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

অনিরুদ্ধের কাছে গিয়ে পাষাণমূর্তির মত সীতা তার দিকে তাকিয়ে থাকল। এত আঘাত সে পেয়েছে যে, কাঁদতেও পারছেনা। সীতার অবস্থা বুঝতে পেরে ডাক্তার বলল,—আপনি কিছু ভাববেন না, অনিরুদ্ধবাবু সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ডাক্তারের কথা যেন সীতা শুনতেও পেলনা। আস্তে আস্তে বসে পড়ল সে অনিরুদ্ধের পাশে।

ইতিমধ্যে প্রবীরও গিয়ে উপস্থিত হল সেখানে। প্রবীরকে দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করল,—আপনি ?

সীতাকে দেখিয়ে প্রবীর বলল,—আমি ওঁর স্বামী।

—ভাল হয়েছে। উনি বড় মানসিক আঘাত পেয়েছেন। আপনি ওঁকে একটু দেখুন।

প্রবীর সীতার কাছে গিয়ে ডাকল,—সীতা !

সীতা প্রবীরের দিকে তাকাল। তারপর 'আমার দাদাকে মেরে ফেলেছে' বলে দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

প্রবীর তাকে ধরে বলল,—শান্ত হও সীতা, শান্ত হও।

ডাক্তার বলল,—ওঁকে কাঁদতে দিন।

প্রবীর ডাক্তারকে বলল,—দাদা কি—

—না, মশায় না। ভয় নেই। তবে জ্ঞান ওঁর ফেরেনি।

—কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে ?

—নিয়ে যেতে পারলে, ভাল হয়। তবে রাস্তায় ঝাঁকি না লাগে।

—আমার বড় গাড়ী আছে। আপনারা দয়া করে ওঁকে তুলে দিন। সীতা, দাদাকে নিয়ে আমরা চল কলকাতায় যাই।

কয়েকজন ধরাধরি করে অনিরুদ্ধকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। অনিরুদ্ধের মাথা কোলে করে গাড়ীতে বসল সীতা।

ডাক্তারকে প্রবীর বলল,—দেখুন, আপনি যদি সঙ্গে যেতে পারেন, ভাল হয়। পথে কোনরকম বিপদ হতে পারে তো !

ডাক্তার বলল,—বেশ, চলুন।

ডাক্তার উপস্থিত একজনকে ডেকে বলল,—আমার বাড়ীতে খবরটা দিও, আমি কলকাতা যাচ্ছি এঁদের সঙ্গে।

পরাণ বলল,—আমিও যাব ডাক্তারবাবু।

প্রবীর বলল,—বেশ তো, চল।

অন্য একজন পরাণকে বলল,—তুমি থাক পরাণ। গুণ্ডা ব্যাটা

ধরা পড়েছে। তাকে তো থানায় নিয়ে গেছে। তুমিই তাকে ধরেছ, তোমাকে থানায় ডাকতে পারে।

ডাক্তার চলল,—তবে তুমি থাক পরাণ। আমি তো সঙ্গে যাচ্ছি, ভয় কি ?

পরাণ আর গেলনা তাদের সাথে। অনিরুদ্ধকে নিয়ে তারা রওনা হল।

সাঁইত্রিশ

হঠাৎ ননী লাহিড়ীর সঙ্গে প্রসাদীর দেখা হয়ে গেল।

দুপুর বেলা হোটেল থেকে ভাত নিয়ে বাসায় ফিরছিল প্রসাদী। রাস্তার ধারে পানের দোকানে পান কিনছিল নায়েব মশাই। নায়েবই আগে প্রসাদীকে দেখেছে। তাড়াতাড়ি পানের খিলি নিয়ে, প্রসাদীর পিছু নিল সে। প্রসাদী ততক্ষণে গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

প্রসাদীর কাছাকাছি এসে নায়েব বলল,—পেসাদি না !

থমকে দাঁড়াল প্রসাদী। পেছন ফিরে নায়েবকে দেখে বলল,—ও, আপনি। আপনিও তাহলে পালিয়েছেন ?

—তা কি করব কও। তোমরা সব ভাল আছ তো ?

—আছি একরকম।

প্রসাদী চলতে সুরু করল।

নায়েব তার সাথে চল্‌তে চল্‌তে বলল,—তোমার বাসা বুঝি কাছেই ?

—হ্যাঁ।

—বেশ হল। এ্যাদ্দিন পর তবুও একজন চেনা মানুষের দেখা পাওয়া গেল। চল, তোমার বাসা দেখে যাই।

প্রসাদী ততক্ষণে প্রায় তার বাসার সামনে এসে পড়েছে। নায়েবের এ কথার পর তাকে আর 'না' করতে পারে না সে।

তা ছাড়া, নায়েবের কাছে গাঁয়ের খবর জানবার আকুলতাও তার কম নয়।

প্রসাদীর সঙ্গে সঙ্গে নায়েব ঢুকল বাড়ীর মধ্যে। ঘরের তালা খুলে ভাতের থালা ঘরে রেখে, দাওয়ায় পাটি পেতে বসতে দিলে নায়েবকে।

নায়েব বলল,—পরাণ কই ? কাজে গিয়েছে বুঝি ? ফিরবে কখন ?

নায়েবের এতগুলো প্রশ্নের উত্তরে প্রসাদী বলল,—সে থাকেনা এখানে।

—ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

কথাটা বলে একটু শব্দ করে হেসে উঠল নায়েব।

প্রসাদী বলল,—শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে, তু'দিন আমরা ষ্টেশনেই ছিলাম। তারপর বাড়ী খুঁজতে সেই যে গেল, আর ফিরল না। আজ পর্যন্তও তার কোন খবর পাইনি।

প্রসাদীর কথা শুনে নায়েব এত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল যে, তার মুখে আর কথা সরল না।

প্রসাদী বলল,—আপনি কতদিন এসেছেন ? গাঁয়ের আর সবাই কেমন আছে ?

—মাঝে মাঝে আমি আসি কলকাতায়। নেরু থাকে আসামে,—তার কাছেই সব পাঠিয়ে দিয়েছি। আমিও আসামে থাকি। আবার কলকাতায়ও আসতে হয় বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে গাঁয়েও গিয়েছিলাম একবার। গাঁয়ের কথা আর কি বলব ? কেউ তো সেখানে নেই।

—কেউ নেই ?

—তু'একজন যা আছে, তা না থাকারই সামিল।

—কেদারের মা ?

—সে আর যাবে কোথায় ? কেদার মারা যাবার পর, পাগলের মত হয়ে গিয়েছে।

—কেদার নেই! কি হয়েছিল ?

—ক'দিন নাকি জ্বরে ভুগেছিল। ডাক্তার তো দেশে নেই যে, চিকিৎসা হবে?

কেদারের মৃত্যুসংবাদ আর কেদারের মায়ের অবস্থা শুনে প্রসাদীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

তা দেখে নায়েব বলল,—থাক, ওসব দুঃখের কথা। শুনে তো খালি কষ্ট পাওয়া। তোমার কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে পেসাদি। তোমার কথা শুনে কেউ আর বলতে পারবেনা যে, তুমি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে।

নায়েবের কথা সত্যি। প্রসাদী চেষ্টা করে কলকাতার কথা রপ্ত করেছে। না করে তার উপায় ছিল না। পাকিস্তানের নিঃসহায় মেয়ে বুঝতে পারলেই, বদ লোক তার পেছনে মাছির মত অনুসরণ করত।

প্রসাদী বলল,—মানুষই বদলিয়ে যায়, তো কথা বদলানো আর এমন কি? ছোটবাবুও এসেছেন নাকি আপনার সঙ্গে?

—ক্ষিতুর কথা বলছ? তার কথা আর বলো না। বড় অপদার্থ লোক সে।

—ছোটবাবু না আপনার বন্ধু?

—আরে সেইজন্যেই তো বলছি। গাঁয়ের সবাই দেখেছে, এতাবৎকাল তাদের তো আমি কম দিই নি? আসতে চাইলে সঙ্গে, ভাড়াপত্র দিয়ে নিয়েও এলাম কলকাতায়। ঘরও তাদের ভাড়া করে দিলাম। গাঁয়ের সব ছেড়ে-ছুড়ে এসে আমারই বা এখন এমন কি অবস্থা! কলকাতায় বসে তাদের সব খরচ জোগানো আর সম্ভব কি? বললাম, ক্ষিতু একটা কাজ-কম্ম জোগাড় করে নাও। তা কে শোনে কার কথা? শেষে বউ-এর যুক্তিতে আমার সঙ্গে বেইমানি করল ক্ষিতু! মরুকগে যাক্,—আমিও আর তাদের খোঁজ করিনে।

—সে কি! কি করে চলছে তাঁদের?

—চলছে তাদের ভালই। কলকাতায় এসে ক্ষিতুর বউ-এর

চোখ ফুটেছে যে। তার এখন অভাব কি? উপকারী পুরোনো বন্ধুকে তাদের এখন আর দরকার নেই। নিত্য নূতন বন্ধু জুটেছে। ব্যবসা ভালই চলছে।

প্রসাদী এ প্রসঙ্গে নায়েবকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। নায়েবও কথা পরিবর্তন করে বলল,—তাহলে এখন তুমি একলাই আছ। কর কি?

—ঝি-গিরি।

—ঈশান মণ্ডলের নাতনী ঝি-গিরি করে, একথা যে ভাবাও যায় না পেসাদি!

প্রসাদী কোন উত্তর দিল না।

নায়েব বলল,—কেন, অনিরুদ্ধবাবু একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারল না তোমার?

—রাঙ্গাদাদাবাবুর দেখা পেলে, নিশ্চয়ই একটা সুব্যবস্থা হত। কিন্তু তাঁর দেখা পাব কোথায়?

—কেন, তার ঠিকানা জাননা তুমি?

—না।

—ও হরি! আমাদের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে অনিরুদ্ধবাবুর যে খুব ভাব।

—আপনার সঙ্গে রাঙ্গাদাবাবাবুর দেখা হয়?

—হ্যাঁ, সেবার কলকাতায় এসে দেখা হয়েছিল। জমিদারের মেয়ের সঙ্গে সব-সময়ই ঘোরে কিনা? ও-সব বড়লোকের ঘরের কথা কি আর বলব?

—তাঁর ঠিকানা জানেন?

—দেখা করবে নাকি অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে? এতদিনে তোমার কথা কি আর তার মনে আছে? এখন কোন সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না পেসাদি। জমিদারের মেয়ে পথ আগলে আছে। জমিদারের মেয়ের সঙ্গে, বুঝলে কিনা, খুব ইয়ে—।

—ছিঃ নায়েব মশায়, ওকি কথা আপনার। জমিদার আপনার মনিব। তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলা কি আপনার উচিৎ?

—ও-সব উচিত অনুচিত জানি না, চোখে ভাল না ঠেকলে সবাই বলবে। তা দেখা করতে চাও, জমিদারের মেয়ের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। অনিরুদ্ধবাবুর ঠিক-ঠিকানা তার কাছেই সব জানতে পারবে। তবে আবার বলছি, সুবিধে হবে না তোমার।

—আমার কোন সুবিধের কথা আমি আর ভাবিনে নায়েব মশাই। জলজ্যান্ত মানুষটা একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল, তাই রাঙাদাদাবাবুকে বলে যদি কোন খোঁজ করতে পারি।

—সত্যিই পরাণের কথা শুনে মনটা কেমন হয়ে গেল। খোঁজ তো করাই উচিৎ। আচ্ছা, জমিদারের মেয়ের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। কবে যাবে?

—কালই যাব।

—আচ্ছা, তাই আসব। এখন উঠি।

* *

নায়েব মশায় যখন চলে গেল, বেলা আর নেই। প্রসাদী ভাত খেতে বসল। জমিদার-কন্যার নামের সাথে অনিরুদ্ধের নাম জড়িয়ে নায়েব মশায় যে ইঙ্গিত করে গেল, প্রসাদীর মনে সেই কথাই বার বার আলোড়িত হতে লাগল। অনিরুদ্ধের ওপর পুঞ্জীভূত অভিমানে তার দু'চোখে ছেপে জল এল। অনিরুদ্ধকে ভালবেসে,—তার ভরসাতেই সব ছেড়ে সে কলকাতায় এসেছিল। আশা করেছিল, দেখা হবে তার সঙ্গে, অনিরুদ্ধের আশে-পাশে সে থাকতে পারবে। এর বেশী সে কিছু প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু অনিরুদ্ধের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কলকাতায় এসে, নানা বিপদ দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করেছে প্রসাদী। মন হতাশায় ভরে উঠেছে। তবুও ক্ষীণ আশা তার অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগরূক ছিল

যে, হয়ত একদিন অনিরুদ্ধের সাথে তার দেখা হবে। কিন্তু কি করে তা সে জানে না। শুধু আশা।

নায়েবের মুখে আজ অনিরুদ্ধের খবর শুনে তার মনে হল, এতদিন শুধুই মরীচিকার পেছনে সে ছুটেছে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের এ ভাব কেটে গেল। নিজের মনকে বোঝাল, প্রতিদানের কোন প্রত্যাশা না রেখেই তো সে ভালবেসেছে। তবে তার মনে কেন এই দুঃখ? নিজের অন্তরের তাগিদে সে ভালবেসেছে। ভালবেসে ভালবাসা পাবে এ আকাঙ্ক্ষা সে করে কেন? অনিরুদ্ধ আর তার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ! আকাশের চাঁদকে ভালবেসে তাকে ধরতে যাওয়া তো নিছক বোকামী। চাঁদের মিলন তো তারার সঙ্গেই স্বাভাবিক।

তবুও অনিরুদ্ধকে একবার দেখবার লোভ সে সংবরণ করতে পারে না। শুধু একবার তাকে দেখে আসবে। পরাণের খোঁজ নেবার কথা বলবে তাকে।

অনিরুদ্ধকে সে ভালবেসেছে, তাই বলে তাকে বিব্রত করবে না সে কোনদিন। দূর থেকে তাকে সে পূজো করবে। মনে-প্রাণে তার পায়ে সে উৎসর্গীকৃত। অনিরুদ্ধ সুখী হলেই সে সুখী। তার কোন সামান্যতম প্রয়োজনেও যদি কোনদিন প্রসাদী নিজেকে লাগাতে পারে, নিজেকে ধন্য মনে করবে সে। অনিরুদ্ধকে অদেয়ও কিছু নেই তার। নৈবেদ্যের থালা সাজিয়ে সারা জীবন ধরে সে শুধু পূজো জানিয়ে যাবে।

অন্তরে অন্তরে যে ব্যাথাটা গুমরিয়ে উঠছিল, তা আর এখন নেই। নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে প্রসাদী মুক্তি খুঁজে পেল। তার মনটা হাল্কা হয়ে গেল।

কথা দিয়ে নায়েব তার পরদিন সকাল বেলাতেই এসে হাজির হল।

প্রসাদী সে দিনটা সদাঠাকুরের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছিল। প্রসাদী কোনদিন কামাই করে না, ছুটিও নেয় না। তাই একদিনের ছুটি দিতে কোন আপত্তি করেনি সদা ঠাকুর।

প্রসাদীকে নিয়ে নায়েব যখন রমার কাছে পৌঁছাল, রমা বাইরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

নায়েব রমাকে বলল,—এই মেয়েটি আমাদের গাঁয়ের ঈশান মোড়লের নাতনী। আমার সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। অনিরুদ্ধ বাবুর সঙ্গে এ দেখা করতে চায়। অনিরুদ্ধ বাবু গাঁয়ে গিয়ে এদের বাড়ীতেই ছিল কিনা! তা আমি তো অনিরুদ্ধবাবুর ঠিকানা জানিনে, আপনি জানতে পারেন মনে করে, আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

—তা ভাল করেছেন। আমি অনিরুদ্ধবাবুর বাড়ীতেই যাচ্ছি এখন। এস প্রসাদী আমার সঙ্গে। প্রসাদীই তো তোমার নাম?

প্রসাদী বলল—হ্যাঁ।

রমা বলল,—আপনি এখন যেতে পারেন নায়েব মশাই।

নায়েব ননী লাহিড়ী তাদের সামনে থেকে চলে গেল।

প্রসাদী বলল,—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

—অনিরুদ্ধবাবু যখন তোমাদের বাড়ীতে থাকতেন, নায়েব মশাই তোমার নাম করে অনেক কথা বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। তাই ত তোমাকে সহজেই চিনতে পারলাম।

—নায়েব মশাই যখন জানিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমার নামে অনেক কুৎসা তিনি লিখেছেন।

—নায়েবকে আমি চিনি। বাবাও জানেন। সুতরাং তোমার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। চল, বাবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে আনি।

প্রসাদীকে নিয়ে রমা মহেন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকে বলল,—বাবা এই মেয়েটিই হচ্ছে ঈশান মোড়লের নাতনী প্রসাদী।

প্রসাদী গড় হয়ে মহেন্দ্রবাবুকে প্রণাম করল। প্রণাম করে উঠে কুণ্ঠিতভাবে বলল,—কত্তাদার মুখে আপনার কত গল্প শুনেছি, আজ প্রথম দেখলাম।

সস্নেহে প্রসাদীকে মহেন্দ্রবাবু বললেন,—বস মা। ঈশান আমাদের বড় আপনার লোক ছিল। তুমি হঠাৎ এখানে এলে কি করে?

রমা বলল,—নায়েব মশায়ের সঙ্গে দেখা হতে, নিয়ে এসেছেন। আচ্ছা বাবা, আমরা এখন চলি। অনিরুদ্ধবাবুর বাড়ীতে যাচ্ছি। ফিরে এলে, প্রসাদীর সঙ্গে গল্প কর।

—আচ্ছা, মা।

প্রসাদীকে নিয়ে রমা গিয়ে গাড়ীতে বসল। আজ ড্রাইভার নেই। ড্রাইভারের অসুখ হওয়াতে ছুটি নিয়েছে। রমা নিজেই ড্রাইভ করছিল। পেছনের সিটে প্রসাদী বসেছিল, তাই সারা রাস্তা তাদের মধ্যে আর কোন কথা হল না।

আটত্রিশ

কাল রাত্রে অনিরুদ্ধকে তার বাড়ীতে নিয়ে আসার পর প্রবীর তার বাড়ী ফেরেনি। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা সব একাই করতে হয়েছে প্রবীরকে। শুধু সে অনাদিভূষণকে একবার টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে, অনিরুদ্ধকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। জ্ঞান ফেরেনি। রাত্রে প্রবীর বাড়ী ফিরতে পারবে না।

প্রবীরের টেলিফোন পেয়ে অনাদিভূষণ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে প্রবীরকে বললেন,—ডাঃ চ্যাটার্জি, ডাঃ রায় সবাইকে 'কল' দাও। যেমন করে হ'ক অনিরুদ্ধকে বাঁচাতে হবে খোকা। আমি তোমার মাকে নিয়ে আসছি।

—চিকিৎসার কোন ত্রুটি আমি রাখব না। আপনাদের এখন এসে দরকার নেই, বাবা। আমি তে আছি!

বেলঘরিয়ার ডাক্তার বাবুটি সে রাত্রে থেকে গেল অনিরুদ্ধের বাড়ীতে।

সে রাত্রে কারোরই আর খাওয়া-দাওয়া হল না। সীতা আর কমলা তো এক মুহূর্তের জন্যে অনিরুদ্ধের কাছ থেকে নড়েনি। সমস্ত রাত্রির মধ্যে অনিরুদ্ধের জ্ঞান ফিরল না। অনিরুদ্ধের পারিবারিক ডাক্তার, ডাক্তার বোসও সব সময় উপস্থিত ছিল।

প্রবীর বেলঘরিয়ার ডাক্তার বাবুটিকে বাইরের থেকে খাবার আনিয়ে রাত্রে খাইয়েছিল। সকাল বেলা সীতাকে ডেকে প্রবীর বলল,—কাল রাত্রে তোমাদের কারো খাওয়া হয়নি। আমি বরং আমাদের রান্নার বামুনটিকে নিয়ে আসি এখানে. কি বল ?

—না। তুমি বাড়ী গিয়ে খেয়ে এসো।

—তোমরা ?

—সে জন্যে ব্যস্ত হয়ো না।

—বাবাকে কাল টেলিফোন করে দাদার খবর জানিয়েছি। উনি তো মাকে নিয়ে কালই আসতে চেয়েছিলেন। আমিই বারণ করলাম। উনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

প্রবীরের কথা শেষ হলে সীতা বলল,—দেখ, একটা কথা আমাকে সত্যি বলবে ?

—তোমাকে সত্যি বলতে পারব না. এমন কোন কথা তো আমার নেই সীতা।

একটু চুপ করে থেকে সীতা বলল,—তুমি কি এই ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানতে না ?

—তুমি কি আমায় সন্দেহ করছ সীতা ?

—না। তবে আমার মন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে।

—যে গুণ্ডাটি দাদাকে মেরেছে, সে ধরা পড়েছে। কে যে সত্যিকারের দোষী, সেও ধরা পড়বে সন্দেহ নেই।

প্রবীরের কথা শুনে হাসল সীতা। বলল,—প্রকৃত দোষী ধরা

পড়বে না। টাকায় সব পাপ চাপা পড়ে। ঐ গুণ্ডাটিই শুধু সাজা পাবে,—আর তার পেছনে যে আছে, তাকে কেউ জানতেও পারবে না। কিন্তু এ গ্লানি আমি কি করে চেপে থাকব, বলত? এ ঘটনার পর তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে আমি আর বাস করতে পারব না। হয়ত সেজন্যে তোমাকেও আমি হারাব। কিন্তু মন যে আমার ভেঙ্গে গেছে, আমি পারব না।

—তুমি যা সন্দেহ করছ, তাই যদি সত্যি হয়, তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে আমাকেই করতে হবে সীতা! এখন এ সব কথা থাক। দাদার কাছে তাঁর বন্ধুরা তো এখন রয়েছেন, তুমি আর ছোটমা একটু বিশ্রাম নাও। কাল থেকে তো তোমরা দাদার কাছে বসে রয়েছ।

প্রবীরের মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,—এই যে বৌমা! বেয়ানকে স্নান করতে পাঠিয়েছি, তুমিও স্নান করে নাও। কি করবে মা, বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়। এ বিপদের সময় আমার কালকে আসাই উচিৎ ছিল। খোকা, তুই নিষেধ করলি কেন? দেখতো, কাল থেকে সবাই উপোষ করে আছে। তুই যা খোকা, আমাদের বামুনঠাকুরকে নিয়ে আয়।

—আমি এক্ষুণি যাচ্ছি মা।

প্রবীর বেরিয়ে গেল।

সীতা বলল,—আমাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না মা।

সীতার শাশুড়ী সীতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,—আমার যে বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে উঠছে, তবুও শান্ত হয়ে আছি বৌমা। অবুঝ হয়োনা। এস আমার সঙ্গে।

সীতার হাত ধরে নিয়ে গেলেন তার শাশুড়ী।

স্ত্রীর সঙ্গে অনাদিভূষণও এসেছেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জন একসঙ্গেই অনিরুদ্ধকে দেখতে তার ঘরে ঢুকেছিলেন।

অনাদিভূষণকে দেখে বিভাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অনাদিভূষণকে সে চেনে।

অনাদিভূষণ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন,—একবারও কি জ্ঞান ফেরেনি।

—না।

অনাদিভূষণের স্ত্রী উচ্ছ্বসিত কান্নাকে দমন করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কমলা উঠে তাঁর পেছনে পেছনে গেল।

অনাদিভূষণও আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। অনাদিভূষণ বুঝতে পেরেছেন, ঘরে যারা উপস্থিত ছিল, অনাদিভূষণকে তারা পছন্দ করেনি।

অনাদিভূষণ সারদাকে সামনে দেখতে পেয়ে বললেন,—আমি বাড়ী যাচ্ছি, এদের বল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনি গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

অনাদিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর একটি ছেলে বিভাসকে বলল,—ভদ্রলোকটি কে বিভাসদা?

—মিলের মালিক, অনাদিভূষণ চৌধুরী।

—তা, হঠাৎ এখানে?

—উনি অনিরুদ্ধের বোনের শ্বশুর।

বিভাসের কথা শুনে, যারা এ খবর জানত না, বিস্ময়ে তারা হতবাক হয়ে গেল।

এমন সময় নীচে থেকে 'বাবু' 'বাবু' বলে কে ডাকছে শুনে বিভাস দেখতে গেল।

পরাণ এসেছে। বিভাসকে দেখে পরাণ বলল,—কেমন আছে দাদাবাবু?

—দেখবে এস।

পরাণকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে এল বিভাস।

অনিরুদ্ধকে কিছুক্ষণ দেখে পরাণ ডাক্তারকে বলল,—দাদাবাবুকে যেমন করে হ'ক বাঁচান ডাক্তারবাবু।

—চেষ্টা তো করছি।

বিভাসকে বলল পরাণ,—জানেন বাবু, গুণ্ডাটা কবুল করেছে। মিলের মালিক নাকি তাকে টাকা দিয়ে দাদাবাবুকে মারবার জন্যে লাগিয়েছিল।

পরাণের কথা শেষ হতেই, ঘরের দরজার কাছে কিছু একটা পতনের শব্দে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সীতা দরজার কাছে বসে পড়েছে। সীতা যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ জানতে পারেনি।

ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি সীতার কাছে এগিয়ে এল।

সীতা বলল,—ব্যস্ত হবেন না, ডাক্তার বোস। আমি ঠিক আছি।

আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল সীতা।

গম্ভীর ভাবে ডাক্তার বোস বলল,—আপনারা সবাই যদি রোগীর ঘর থেকে বাইরে যান, তবে ভাল হয়।

বিভাস বলল,—চল পরাণ, আমরা নীচের ঘরে যাই।

পরাণ জানেনা, মিলের মালিকের সঙ্গে অনিরুদ্ধের কি সম্পর্ক।

অনিরুদ্ধের বন্ধুরা সবাই নীচের ঘরে গিয়ে বসল।

প্রবীর বামুন ঠাকুরকে নিয়ে ফিরে এল।

একলা ঘরে বিছানায় উপুর হয়ে পড়ে কাঁদছিল সীতা। কমলা তাকে কাঁদতে দেখে গেছে। ডাকেনি তাকে।

প্রবীরকে কমলা বলল,—তুমি একবার সীতার কাছে যাও। সে বড় কাঁদছে।

প্রবীর ঘরে ঢুকে সীতাকে একইভাবে কাঁদতে দেখল। সীতার পিঠে হাত রেখে প্রবীর ডাকল,—সীতা।

উঠে বসল সীতা।

বলল,—আর সন্দেহ নয়। সব সত্যি। তোমার বাবাই দাদাকে মারবার জন্যে গুণ্ডা লাগিয়েছিলেন। মিল থেকে একজন লোক এসেছে, তার কাছে গিয়ে শুনে এস।

প্রবীরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। প্রবীর বলল,—আচ্ছা, আমি নিজে গিয়েই সব শুনছি। আর সত্যিই যদি বাবা একাজ করে থাকেন, আমিও ও বাড়ীতে ফিরে যাব না।

প্রবীর ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

অনিরুদ্ধের ঘরে ঢুকে প্রবীর দেখল, কমলা অনিরুদ্ধের মাথার কাছে বসে আছে। আর ঘরে রয়েছে ডাক্তার বোস।

প্রবীর বলল,—ডাক্তারবাবু, এখনও কি একই অবস্থা।

ডাক্তার বোস বলল,—ডাক্তারের রায়ের নির্দেশ মত আমি এখন একটি ইনজেকসান দিলাম। আশা করছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে। আর যদি জ্ঞান না ফেরে—

—বুঝেছি ডাক্তার বোস।

প্রবীর আর কিছু না বলে চলে গেল ঘর থেকে।

নীচের ঘরে পরাণকে নিয়ে সবাই বসে আলোচনা করছিল। প্রবীর ঘরে ঢুকল। পরাণকে দেখে প্রবীর বলল,—তুমিই ত মিল থেকে আসছ?

—হ্যাঁ, বাবু।

—দাদাকে কে মেরেছে, তুমি জান?

পরাণ চুপ করে থাকল। বিভাস বলল,—উনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি বল পরাণ।

ঠিক সেই মুহূর্তে রমা আর প্রসাদী এসে সেখানে উপস্থিত হল।

সবাইকে সেখানে দেখে রমা বলল,—কি ব্যাপার, আপনারা যে সবাই এসেছেন দেখছি?

বিভাস বলল,—কেন, আপনি কিছু শোনেন নি?

—কি হয়েছে, বলুন তো?

—অনিরুদ্ধকে কাল বিকেলে বেলঘরিয়াতে গুণ্ডায় লাঠি মেরে সাংঘাতিক জখম করেছে। কাল থেকে অনিরুদ্ধের জ্ঞান ফেরেনি।

—সে কি!

—যান, ওপরে রয়েছে অনিরুদ্ধ।

রমা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেল। প্রসাদীও গেল তার পেছনে পেছনে।

প্রসাদীকে দেখে পরাণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। পরাণকে দেখতে পায়নি প্রসাদী। এতগুলো লোক দেখে, কারোর দিকেই সে তাকায়নি।

রমা আর প্রসাদী অনিরুদ্ধের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অনিরুদ্ধের মাথার কাছে তখনও কমলা বসে ছিল।

রমা বলল,—আমি তো কিছুই জানতে পারিনি। এমন যে ঘটতে পারে, ভাবতেও পারিনি।

কমলা বলল,—চল, ওঘরে গিয়ে বসি।

পাশের ঘরে তাদের নিয়ে এসে কমলা বলল,—বস তোমরা।

রমা বসল। প্রসাদী বসতে ইতস্ততঃ করছিল। রমা তার হাত ধরে বসাল।

কমলা বলল,—একে তো চিনতে পারছি না।

রমা বলল,—আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। ঈশান মণ্ডলের নাতনী, প্রসাদী। গাঁয়ে গিয়ে অনিরুদ্ধবাবুরা এদের বাড়ীতেই ছিলেন। অনিরুদ্ধবাবুর সঙ্গে ও দেখা করতে এসেছে।

এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি প্রসাদী। এখন সে মুখে কাপড় গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কমলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—কাঁদছ কেন প্রসাদী? কাঁদতে নেই।

প্রসাদীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কমলা।

কান্না-জড়িত স্বরে প্রসাদী বলল,—রাঙ্গাদাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে বলে, দু'বছর ধরে আশা করে থেকে,—শেষে কি এই দেখতে এলাম আমি !

কমলা বলল,—দুঃখ করোনা প্রসাদী। ভগবানকে বল, তিনি যেন অনিরুদ্ধকে ভাল করে তোলেন।

রমা বলল,—প্রসাদী বস, আমি নীচে যাচ্ছি।

রমা চলে গেলে, কমলা বলল,—চল প্রসাদী, আমরা অনিরুদ্ধের কাছে যাই।

প্রসাদীকে নিয়ে কমলা আবার অনিরুদ্ধের ঘরে ফিরে এল।

কমলা তার পূর্বস্থানে অনিরুদ্ধের মাথার কাছে গিয়ে বসল। প্রসাদী বসল, অনিরুদ্ধের পায়ের কাছে। প্রসাদীর কান্না কিন্তু বাধা মানল না। তার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

নীচের ঘরে পরাণ এতক্ষণ প্রবীরকে সব বলছিল। রমাও গিয়ে বসল সে ঘরে।

পরাণ বলছিল,—গুণ্ডাটির নাম রামদীন। তার একটা পা খোঁড়া।

রমা বলল, —নাম রামদীন ? পা খোঁড়া ?

—হ্যাঁ দিদিমণি।

—দেখতে খুব রোগা ?

—হ্যাঁ দিদিমণি।

—কি বলেছে সে ?

—মিলের মালিক তাকে টাকা দিয়ে দাদাবাবুকে মারবার জন্যে লাগিয়েছিল।

রমা বলল,—বিভাসবাবু, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে। আমি লোকটিকে দেখব। লোকটি হয়ত সব কথা সত্যি বলেনি।

—আপনি চেনেন নাকি লোকটিকে ?

—না দেখে বলতে পারব না। পরাণ, আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

পরাণ বলল,—চলেন, যাব।

রমা উঠে পড়ল। বিভাসকে বলল,—আমি ফিরে এসে আপনাদের জানাব।

পরাণকে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসল রমা।

উনচল্লিশ

বেলঘরিয়ার থানাতে গিয়ে রমা দারোগাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল,—রামদীন বলে যে গুণ্ডাটিকে আপনারা ধরেছেন, আমার মনে হয় সে আপনাদের কাছে সত্য কথা বলেনি। তার সঙ্গে আমি দেখা করলে, প্রকৃত কথা বুঝতে পারব।

—আপনাদের সাক্ষাতের সময় আমি উপস্থিত থাকলে, আপনার আপত্তি আছে?

—আপনাকে দেখে হয়ত সত্য কথা সে বলবে না। আপনি আড়ালে থেকে আমাদের কথা শুনতে পারেন।

—বেশ, চলুন।

রমা বলল,—পরাণ তুমি বস এখানে।

দারোগার সঙ্গে রমা চলে গেল।

রামদীনকে লক্-আপে রাখা হয়েছে। দারোগা রমাকে বলল,—আপনি সামনে দিয়ে যান। ঐ লক্-আপে আছে সে। আমি অন্য দিক দিয়ে যাচ্ছি।

রমা যা অনুমান করেছিল, ঠিক তাই। লোকটি মিঃ কনক চৌধুরীর ভৃত্য, রামদীন।

রামদীন যে লোক ভাল নয় আর কনক চৌধুরী তাকে জেল থেকে বাঁচিয়ে নিজের কাছে চাকরি দিয়েছে, এ গল্প কনক চৌধুরীই একদিন রমাকে বলেছিল।

পরাণের মুখে রামদীনের চেহারার বর্ণনা শুনে রমার মিঃ কনক

চৌধুরীর গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। রামদীনকে সে নিজে বহুবার মিঃ কনক চৌধুরীর বাড়ীতে দেখেছে।

হাসপাতালের সেদিনের সে ঘটনার পর থেকে কনক চৌধুরী রমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করেনি, বা তাদের বাড়ীতেও আসেনি। মিঃ চৌধুরী যে খুবই চটেছে তাতে সন্দেহ নেই। পরাণের মুখে রামদীনের কথা শুনে রমার মনে মিঃ চৌধুরী সম্বন্ধে নানা সন্দেহের ঢেউ খেলে গেল। রামদীনকে দেখবার জন্যে তাই সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

রমাকে দেখতে পেয়ে রামদীন উল্লসিত হয়ে বলে উঠল,—দিদিমণি আপনি?

—হ্যাঁ।

—সাহেব আসেননি?

—সাহেব আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন।

রামদীন এদিক ওদিক দেখল। না, কেউ নেই। তারপব রমাকে বলল,—সাহেবকে বলবেন দিদিমণি, রামদীন বেইমান নয়। সাহেবের নাম কেউ জানতেও পারবে না আমার কাছ থেকে।

—তুমি ধরা পড়লে কি করে রামদীন?

—নসিব দিদিমণি, নসিব! এই খোঁড়া পা বেইমানি করল, না হলে আমাকে ধরতে পারত না কেউ।

—তুমি মিলের মালিকের নাম করলে কেন?

—আমি ধরা পড়বার পর বুঝলাম এখানকার মিলের মালিকের ওপর সন্দেহ করেছে সবাই। আমার বুদ্ধি খুলে গেল, আমিও মিলের মালিকের নাম করে বললাম, তারই হুকুমে আমি একাজ করেছি।

—মিলের মালিককে তুমি চেন নাকি?

—কোনদিনও দেখিনি তাকে।

—আচ্ছা, আজ যাই রামদীন। তোমার সাহেব আবার তোমাব খবর জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন।

রমা আর কিছু না বলে চলে গেল।

মিঃ চৌধুরী রামদীনকে শুধু বলেছিল, অনিরুদ্ধ তার ও রমার শত্রু। অনিরুদ্ধকে চিনিয়ে দিয়েছিল সে। রামদীন ভেতরের কথা কিছু জানে না। তাই রমাকে দেখে সে উল্লসিত হয়ে সব বলে ফেলল।

রামদীন ও রমার কথোপকথন থানার দারোগা তাদের অলক্ষ্যে থেকে সবই শুনেছিল।

রমাকে দারোগা বলল,—বুঝলাম না তো কিছু? সাহেবটি কে?

—বলছি। আপনি সবই তো শুনেছেন; মিলের মালিক নির্দোষ। দোষী হচ্ছে সাহেব, মানে, কলকাতার ব্যারিষ্টার কনক চৌধুরী। ব্যারিষ্টার কনক চৌধুরীর সাথে বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। এতদিন আমার বি, এ, পরীক্ষার জন্যে বিয়েটা স্থগিত ছিল। ক'দিন আগে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আমি মোটরে বাড়ী ফিরছিলাম। মিঃ চৌধুরী একটি ছেলেকে চাপা দেন। চাপা দেবার পর তিনি জোরে গাড়ী চালিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি বাধা দিই। ইতিমধ্যে অনিরুদ্ধবাবু ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। তিনিই ছেলেটিকে নিয়ে শম্ভুনাথ হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। ছেলেটি এখনও হাসপাতালে আছে। তার একখানা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। হাসপাতালে অনিরুদ্ধবাবুর সামনেই সেদিন আমি মিঃ চৌধুরীর এই হৃদয়হীন ব্যবহারের জন্যে কিছু বলেছিলাম। মিঃ চৌধুরী এতে খুবই চটে যান। অনিরুদ্ধবাবুকে তিনি কোনদিনই সুনজরে দেখেননি। কারণ, অনিরুদ্ধবাবুর সংঘের আমি একজন নারী কর্মী। অনিরুদ্ধবাবুকেও মিঃ চৌধুরী সেদিন কটূক্তি করেছিলেন। কিন্তু এর জন্যে মিঃ চৌধুরী যে অনিরুদ্ধবাবুকে খুন করবার মতলব করতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনি। আজ রামদীনের নাম এই পরাণ মণ্ডলের মুখে জানতে পেরে, আমার সন্দেহ হল। তাই রামদীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমি এখানে ছুটে এসেছি।

দারোগা এতক্ষণ রমার কথা শুনছিল। রমা থামতে দারোগা বলল,—একটা কথা আপনি স্পষ্ট করে বলবেন রমা দেবী ?

—বলুন।

—অবশ্য এই মামলার তদন্তে নিঃসন্দেহ হবার জন্যেই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনিই আমাদের মামলার প্রধান সাক্ষী। আচ্ছা, আপনি অনিরুদ্ধবাবুকে ভালবাসেন ?

রমা মাথা নীচু করে বলল,—হ্যাঁ, বাসি।

—আর সেই কারণে মিঃ চৌধুরী অনিরুদ্ধবাবুকে ঈর্ষা করতেন। আপনার আর অনিরুদ্ধবাবুর মেলামেশা পছন্দ করতেন না মিঃ চৌধুরী অনেকদিন থেকেই। সেদিন হাসপাতালে অনিরুদ্ধবাবু আর আপনাকে একসঙ্গে দেখে আর অনিরুদ্ধবাবুর সামনে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার বচসা হওয়ায়, সেই দিনই বোধহয় অনিরুদ্ধ বাবুকে খুন করবার মতলব মিঃ চৌধুরীর মনে হয়। আপনি বলছেন, অনিরুদ্ধ বাবুকেও উনি কটূক্তি করেছিলেন। এখন ভেবে বলুন তো, আমি যা বললাম, তা ঠিক কিনা ?

—বোধ হয়, তাই।

—ধন্যবাদ রমা দেবী। মিঃ কনক চৌধুরীর ঠিকানাটা এবার বলুন তো ?

—চলুন, আমি আপনাদের সঙ্গেই যাব।

—বেশ, চলুন। এক মিনিট। আপনার ষ্টেটমেণ্টটা উনি লিখছেন। আপনি পড়ে একটা সই করে দিন। হয়েছে লেখা ?

সামনে উপবিষ্ট অন্য একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল দারোগাবাবু। অফিসারটি যে এতক্ষণ তার ষ্টেটমেণ্ট লিখে যাচ্ছিল, বুঝতে পারেনি রমা।

অফিসারটি একখানা খাতা রমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল,—আপনি সবটা পড়ে নীচে একটা সই দিয়ে দিন।

রমা ষ্টেটমেণ্টটা পড়ে সই করে দিল।

তারপর রমা পরাণ আর কয়েকজন কনেষ্টবলকে নিয়ে দারোগাবাবু রওয়ানা হল।

মিঃ কনক চৌধুরীর সেদিন কোর্ট বন্ধ। নীচে ড্রইংরুমেই সে বসে ছিল।

প্রথমে রমা একা ঢুকল।

রমাকে দেখে ব্যঙ্গ করে মিঃ কনক চৌধুরী বলল,—একি, রমা দেবী যে? আসুন, আজ কি আমার সৌভাগ্য!

—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কে বলতে পারে মিঃ চৌধুরী!

—তারপর, কি মনে করে রমা দেবী?

আপনার জন্যেই আমাকে আসতে হল মিঃ চৌধুরী। আপনি প্রচণ্ড ভুল করেছেন। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে করতে হবে।

—কথাগুলো যে বড্ড হেঁয়ালী শোনাচ্ছে রমা দেবী।

ঠিক তখনই পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে মিঃ চৌধুরীকে বলল,—গুণ্ডা দিয়ে অনিরুদ্ধবাবুকে হত্যা করবার অপরাধে লিপ্ত থাকায় আপনাকে গ্রেপ্তার করছি মিঃ চৌধুরী।

হতভম্ব কনক চৌধুরীকে দু'জন কনেষ্টবল হাত কড়া পরিয়ে দিল।

মিঃ চৌধুরী বলল—ও, এইজন্যে তবে আপনি এসেছিলেন রমা দেবী?

রমা কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রমা সোজা গিয়ে তার গাড়ীতে বসল। পরাণ গাড়ীতেই বসে ছিল।

মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে পুলিশ অফিসার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতেই রমা বলল,—আমি এখন যাচ্ছি, দারোগাবাবু।

দারোগা রমাকে নমস্কার করে বলল,—আচ্ছা।

রমা দারোগার পেছনে হাত-কড়া দেওয়া মিঃ চৌধুরীর দিকে তাকাল না।

গাড়ী ছেড়ে দিল রমা।

মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে জীপ গাড়ীতে গিয়ে উঠল পুলিশ অফিসার।

চল্লিশ

রমা চলে যাওয়ার পরেই অনিরুদ্ধের জ্ঞান ফিরে আসে। ঘরে তখন ডাক্তার বোস, প্রসাদী আর কমলা ছিল।

প্রথম চোখ খুলে কমলার মুখের দিকে ভাবলেশহীন ভাবে তাকাল অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কমলা বলল,—আমি কমলা। তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে অনিরুদ্ধ ?

কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের একখানা হাত মাথায় ব্যাণ্ডেজের ওপর রাখল অনিরুদ্ধ। তার মাথা, গলা ও ঘাড়ের পাশ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা। শুধু চোখ দুটো আর মুখের কিছুটা ব্যাণ্ডেজের বাইরে। হাত দিয়ে ব্যাণ্ডেজটা অনুভব করতে লাগল অনিরুদ্ধ।

কমলা আবার বলল,—কষ্ট হচ্ছে ?

অনিরুদ্ধ আস্তে আস্তে বলল,—হ্যাঁ।

ডাক্তার বোস্ বলল,—ওকে বেশী কথা বলাবেন না।

প্রসাদী ছিল পায়ের কাছে বসে। উঠে সে অনিরুদ্ধের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রসাদীকে দেখতে পেয়ে, অনিরুদ্ধের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কমলা ইঙ্গিতে প্রসাদীকে অনিরুদ্ধের কাছে বসতে বলল।

অনিরুদ্ধের বুকের কাছে এসে বসল প্রসাদী। প্রসাদীর দু'চোখ দিয়ে জল ঝড়ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়িয়ে ধরে ক্রন্দনের বেগ রোধ করতে লাগল সে।

অনিরুদ্ধ একখানা হাত আস্তে আস্তে তুলে প্রসাদীর চোখের জল মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করল। অনিরুদ্ধ বড় দুর্বল। তার হাত কাঁপতে লাগল। প্রসাদী তার হাতখানা ধরে ফেলল।

ক্ষীণ কণ্ঠে আস্তে আস্তে অনিরুদ্ধ বলল,—পরাণ তোমাকে বড় ভালবাসে প্রসাদী। তাকে সুখী ক'রো।

প্রসাদী কোন উত্তর দিতে পারল না। মুহুর্মুহুঃ তার দু'চোখ জলে ভরে উঠতে লাগল। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল চোখের জল।

হঠাৎ একটা হেঁচকা টান দিয়ে অনিরুদ্ধের মাথাটা বালিশের ওপর কাৎ হয়ে পড়ল।

ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি নাড়ি পরীক্ষা করে অনিরুদ্ধের হাতখানা নামিয়ে রাখল।

ঠিক সেই সময় প্রবীর ঘরে ঢুকল। ডাক্তার বোসের দিকে তাকাতে, ডাক্তার বোস মুখ নামিয়ে নিল।

এতক্ষণে বুঝতে পেরে, ডুকরে কেঁদে উঠল প্রসাদী। কমলা বিছানা থেকে নেমে ঘরের বাইরে চলে গেল।

ডাক্তার বোস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরাণকে নিয়ে রমা যখন ফিরে এল, বাড়ীতে তখন শ্মশানযাত্রার আয়োজন চলছে।

পরাণ বুঝতে পেরে, মাটিতে বসে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

রমা ওপরে উঠে গেল।

মৃতের ঘরে অনেকের মধ্যে বিভাসকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে বাইরে নিয়ে এল রমা।

বিভাসকে সে জিজ্ঞাসা করল,—কতক্ষণ মারা গেলেন ?

—আপনি বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই একবার মাত্র সামান্যক্ষণের জন্যে জ্ঞান হয়েছিল। তারপরেই হঠাৎ হার্টফেল করে।

—আমি প্রকৃত অপরাধীকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে এসেছি। মিল-মালিক নির্দোষ।

—তাই নাকি ? এ খবরটা এখনই সীতা আর প্রবীরবাবুকে

জানানো দরকার। সীতাকে আপনি এ খবর দিন। আমি প্রবীর বাবুকে বলছি।

—আচ্ছা।

একটি ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছিল সীতা। কমলা তার পাশে বসে সীতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল আর নিজেও কাঁদছিল।

রমা সীতার পাশে গিয়ে বসে বসল,—সীতা তোমার শ্বশুর সম্পূর্ণ নির্দোষ। প্রকৃত অপরাধীকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে এসেছি।

কমলা বলল,—সবাই জেনেছে এ কথা?

—বিভাসবাবু প্রবীরবাবুকে বলেছেন।

—প্রবীরবাবুকে ডেকে দেবে ভাই?

—দিচ্ছি।

রমা চলে গেল।

একটু পরে প্রবীর এল।

কমলা বলল,—প্রবীর তোমার বাবাকে সবাই ভুল বুঝেছিল। তোমার মাও সকলের মনের ভাব বুঝতে পেরে, হয়ত নিজের লজ্জা ঢাকতে, চলে গেছেন। তিনি বড় আঘাত পেয়েছেন। তুমি সব কথা বলে তাঁদের খবরটা জানিয়ে দাও।

—আচ্ছা, ছোট মা।

চলে গেল প্রবীর।

একচল্লিশ

কয়েক মাস পরের কথা।

মহেন্দ্রবাবু ইজিচেয়ারে বসে সকাল বেলা কাগজ পড়ছিলেন।

ক্রাচে ভর দিয়ে শ্যামল আর রমা এল। রমা বলল,—বাবা, শ্যামল আজ প্রথম স্কুলে যাচ্ছে, তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

শ্যামলের মাথায় হাত দিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন,—থাক বাবা, আমি এমনিতেই তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তুমি বড় হও।

—চল শ্যামল, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। শ্যামলকে নিয়ে রমা চলে গেল।

কিছু পরে রমা মহেন্দ্রবাবুর ঘরে পুনরায় ঢুকে বলল,—বাবা, স্কুলে যাবার সময় আর স্কুল থেকে তার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিতে আমি ড্রাইভারকে বলেছি।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—তা বেশ করেছ। কিন্তু মিথ্যে মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছ মা। শ্যামল পরের ছেলে, বড় হয়ে তোমার কথা হয়ত ও মনেও রাখবেনা। দুঃখ পাবে তুমি।

—না বাবা, শ্যামলের উপর তো আমার কোন দাবী নেই। যা করছি, সেটুকু ওর পাওনা। আমি ঋণ শোধ করছি বাবা। আমাকে যদি ওর মনে নাই বা থাকে, আমি দুঃখ পাব না।

একটু চুপ করে থেকে মহেন্দ্রবাবু বললেন,—আমার শরীরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ, মা। হয়ত আর বেশীদিন বাঁচব না। মরবার আগে তোকে যদি সুখী দেখে যেতে পারতাম!

—তুমি মিথ্যে ভাবছ বাবা। এই তো আমি বেশ সুখে আছি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাব, সাধ্যমত জনসেবা করব—এতেই আমার তৃপ্তি। অনিরুদ্ধবাবু যে আদর্শ আমার সামনে রেখে গেছেন, মনে-প্রাণে আমি তা গ্রহণ করেছি বাবা। নিজের বলে আমার কিছু প্রত্যাশা নেই, তাই দুঃখ পাবার সম্ভাবনাও নেই। তুমি আমাকে বিয়ে করতে বলোনা বাবা; বিয়ে আমি করব না।

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রমার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহেন্দ্রবাবু। তাঁর বুক থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

হস্তস্থিত খবরের কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধরলেন মহেন্দ্রবাবু।

অনিরুদ্ধের হত্যার বিচার শেষ হয়ে গেছে।

রামদীন বলেছিল, মিলের মালিকের হাত থেকে সে টাকা নিয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে মিলের মালিককে সে সনাক্ত করতে পারেনি।

রমার সাক্ষীতে সমস্ত ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। রামদীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর মিঃ কনক চৌধুরীর দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

অনাদিভূষণের মিলেও গোলমাল মিটে গেছে। পরাণকে পুনরায় কাজে বহাল করা হয়েছে। পুরোনো ম্যানেজারের জায়গায় নূতন ম্যানেজার এসেছে।

পরাণের ঘরের ঘরনী হয়ে এসেছে প্রসাদী। সীতা শ্বশুর-ঘর করছে।

বাহ্যতঃ সংসারের কোথায়ও তেমন কিছু ওলোট-পালোট হয়নি। মনে হয়, সবই তো ঠিক চলছে।

কিন্তু তাই কি ?

নিস্তব্ধ দুপুরে, পরাণ যখন কারখানায় থাকে, দাওয়ায় বসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখে প্রসাদী ? বুকের ভেতরে তার কিসের শূন্যতা হুহু করে চোখের জল তার গাল বেয়ে পড়ে। পরাণ সে খবর পায়না।

আর কমলা ? সারা দিনরাত্রি নিস্তব্ধ বাড়ীটার মধ্যে তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। বার বার অনিরুদ্ধের পরিত্যক্ত জিনিষগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। সারাদিন কাজের মধ্যে মনটা ডুবিয়ে রাখতে সে চেষ্টা করে। কিন্তু মন বড় বিশ্বাসঘাতক—শুধু কাঁদায়। সবার অলক্ষ্যে সে চোখের জল মোছে।